সিলো
কষ্টের উপশম
এবং
অন্তর চাহনি

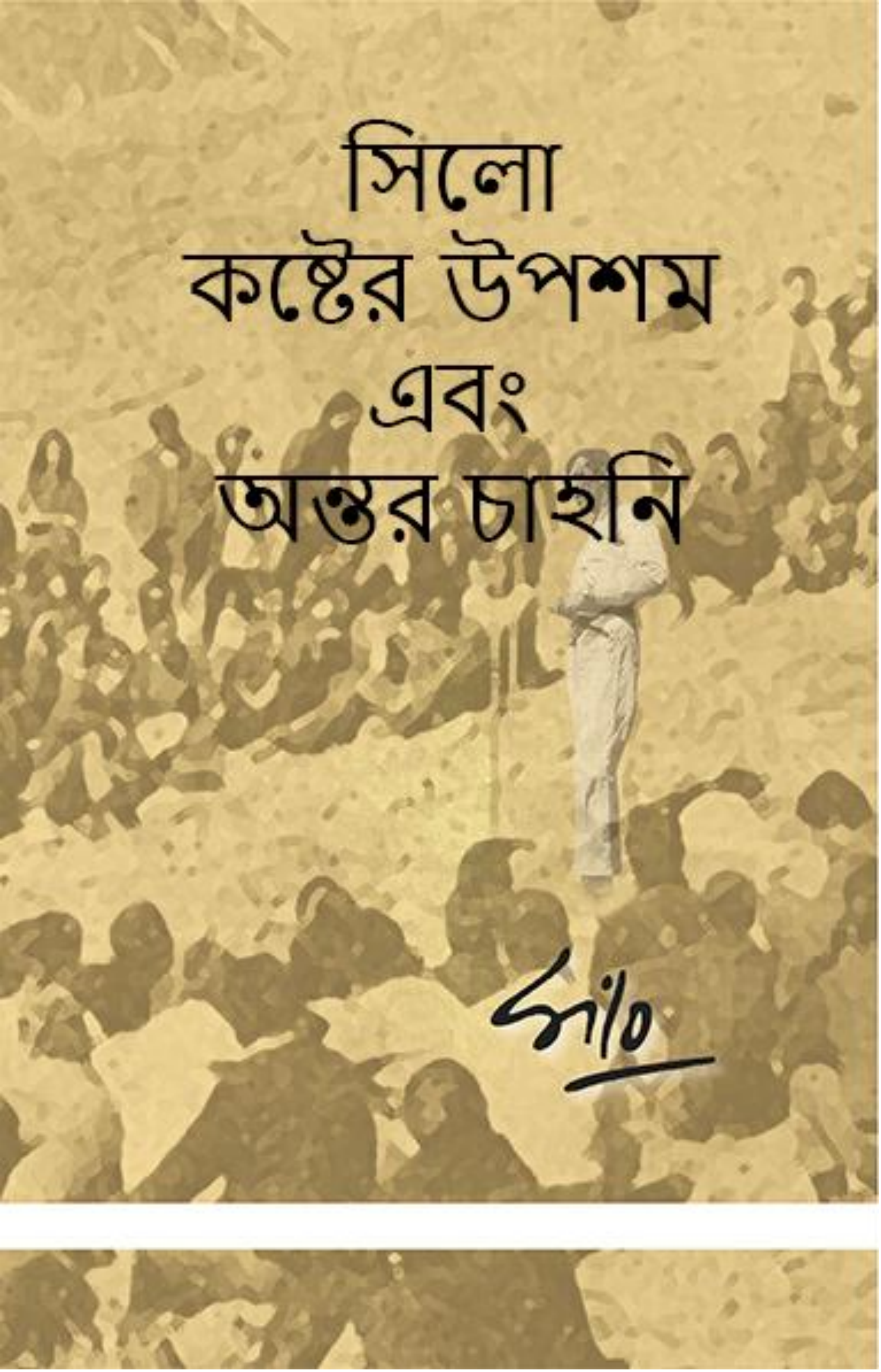

সিলো

কষ্টের উপশম

এবং

অন্তর চাহনি

কষ্টের উপশম

অন্তর চাহনি

©সিলো

সংকলনঃ মারিও গাজেল রোখাস

ISBN: ৯৭৮-৯৯৩০-৫২৯-৮৩-৬

ডিজিটাল সংস্করণ এবং মুদ্রণ:

EdiNexo E.I.R.L

সান হোসে, কোস্টা রিকা,

দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৬

সূচীপত্র

এই সংস্করণের ব্যাপারে নোট

কষ্টের উপশম (La Curación del Sufrimiento)

অন্তর চাহনি (La Mirada Interna)

I. মেডিটেশন
II. বুঝতে চাইবার সাগ্রহ ইচ্ছা
III. অর্থহীনতা
IV. নির্ভরতা
V. অনুভূতিকে সন্দেহ করা
VI. স্বপ্ন এবং জেগে ওঠা
VII. শক্তির উপস্থিতি
VIII. শক্তির নিয়ন্ত্রণ
IX. শক্তির বহিঃপ্রকাশ
X. অনুভূতির প্রমাণ
XI. আলোকিত কেন্দ্রবিন্দু
XII. অনুভবের আবিষ্কার
XIII. মূলনীতি
XIV. মনের অভ্যন্তরীণ পথ প্রদর্শন
XV. শান্তির অভিজ্ঞতা এবং শক্তির যাত্রা গাঁথা
XVI. শক্তির অভিক্ষেপণ
XVII. শক্তি হানি এবং শক্তির অবদমন
XVIII. শক্তির ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া
XIX. অন্তরের বিভিন্ন স্তর
XX. অন্তরের বাস্তবতা

বার্তা (El Mensaje), *সিলোর মন্তব্য*

লেখকের সম্পর্কে

২য় সংস্করণের ব্যাপারে নোট

লাতিন আমেরিকার স্বনামধন্য চিন্তাবিদ মারিও লুইস রোদ্রিগেজ কোবোস, সিলো (৬ই জানুয়ারি ১৯৩৮ – ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০১০) এর ভাব উদ্রেককারী বিবৃতি "La Curación del Sufrimiento" এবং *La Mirada Interna* বইটির সম্মিলিত সংস্করণ এই মুদ্রণে ছাপা হয়েছে। পূর্ববর্তী বই *El Mensaje de Silo* এর আলোকে সিলোর নিজস্ব ব্যাখ্যায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই প্রকাশনা সম্পন্ন হয়েছেঃ বিবৃতি "La Curación del Sufrimiento" এবং *La Mirada Interna* বইটি।

"La Curación del Sufrimiento" *Habla Silo* y *La Mirada Interna* বইটি হতে নেয়া হয়েছে, যেটা কিনা আবার *Humanizar la Tierra* বইয়ের অংশ বিশেষ, উভয়ই la Colección Nuevo Humanismo এ প্রকাশিত হয়েছিল।

এদুয়ারদো মোঙ্গে

কষ্টের উপশম

La Curación del Sufrimiento

পুন্তা দে বাকাস,
মেন্দোজা, আর্জেন্টিনা,
৪ই মার্চ, ১৯৬৯

বিবৃতি

যদি কোন জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হতে এখানে এসেছেন তবে জেনে রাখুন যে আপনি ভুল পথে চলেছেন। কারণ প্রকৃত জ্ঞান বই আর বিবৃতিতে পাওয়া যায়না। প্রকৃত ভালবাসা যেমন আপনার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিরাজ করে ঠিক সেভাবে আপনার চেতনার গহীন অন্তঃস্থলে এই জ্ঞানের প্রাপ্তি সম্ভব।

যদি পরনিন্দাকারী আর ভণ্ডদের প্ররোচনায় পড়ে এই আশায় এই ব্যক্তির ভাষণ শুনতে এসে থাকেন যে প্রাপ্ত জ্ঞান তারই বিরুদ্ধে ব্যবহার করবেন, তাও আপনি ভুল পথে চালিত হয়েছেন কারণ এই ব্যক্তি আপনাকে কিছুই বলতে আগ্রহী নয়, আপনাকে দিয়ে তার কোন কাজ হবে না কারণ আপনার কোন প্রয়োজনই তার কাছে নেই।

এমন এক ব্যক্তির কথা শুনতে আপনি এসেছেন যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়মকানুনের ব্যাপারে বিচলিত নয়, ইতিহাসের কোন আইনকানুন তাঁকে বেঁধে রাখতে পারবেনা এবং যে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বেড়াজাল থেকে দূরে। নাগরিক কংক্রিটের মায়াজাল আর অবাস্তব সব আকাঙ্ক্ষার হাতছানি থেকে শতবর্ষ দূরে আপনার মনোবলকে চালিত করাই এই ব্যক্তির উদ্দেশ্য। সেইসব শহর যেখানে প্রতিটি দিন হল মৃত্যুর দিকে ধাবিত হওয়া ক্ষয়ে চলা এক বাসনা, যেখানে ভালবাসা জন্ম দেয় ঘৃণার, যেখানে ক্ষমা জাগিয়ে তোলে প্রতিশোধ, সেইসব ধনী গরীবের শহর, বিস্তর পরিসর জুড়ে থাকা সেইসব মানুষের শহর যেখানে দুঃখকষ্টের এক প্লাবন বয়ে চলেছে।

যাতনা বোধ হয় যখন শরীরে বেদনা অনুভূত হয়, কষ্ট হয় যখন ক্ষুধা করে দেয় শরীরকে অবশ। তথাপি শরীরের তাৎক্ষণিক অনুভূত হওয়া এই বেদনাই কেবল পীড়া দেয় না, শরীরের মাঝে দানা বাঁধা

নানান রোগভোগের কারণেও জর্জরিত হতে হয় ব্যথা-বেদনার বেড়াজালে।

দুই ধরণের বেদনার মধ্যে পার্থক্যভেদ বুঝতে হবে। এক ধরণের বেদনা আছে যেটার উৎপত্তি রোগব্যাধির কারণে হয় (এবং বিজ্ঞানের বিকাশের কারণে এধরণের রোগভোগের মাত্রা পর্যায়ক্রমে কম হলেও হতে পারে, ঠিক যেভাবে ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা হলে ক্ষুধার তাড়নাও লাঘব হতে পারে)। আরেক ধরণের বেদনা আছে যেটা কিনা শরীরের কোন রোগের ওপর নির্ভর করে না বরং সেই রোগ থেকেই উৎপন্ন হয়। যদি আপনাকে বাঁধা দেয়া হয়, যদি আপনার দৃষ্টিশক্তি বা শ্রুতিশক্তি হয় রুদ্ধ, কষ্ট আপনি পাবেন। যদিও এই ধরণের বেদনার উৎপত্তি আপনার শরীর বা শরীরের কোন রোগব্যাধি হতে হয়েছে, তবু যে কষ্ট আপনি পাবেন সেটার কেন্দ্র হল আপনার মনের মাঝে।
এক ধরণের কষ্ট আছে যেটা বিজ্ঞানের বিশাল বিকাশ অথবা ন্যায়বিচারের আলোর সামনে চিরনাজুক। এই ধরণের কষ্ট, যেটা কিনা আপনার মনের গহীনে আর্তনাদ করছে, কেবলমাত্র বিশ্বাস, জীবন উল্লাস আর ভালবাসার মাধ্যমেই উপশমিত হতে পারে। জেনে রাখুন যে এই ধরণের কষ্টের উৎপত্তি সবসময়ই আপনার বিবেকের মাঝে বয়ে চলা ঝড়ের কারণেই হয়ে থাকে। কষ্ট পান কারণ প্রতিনিয়ত এই ভয়েই কালযাপন করছেন যেন যা আছে তা যেন হারিয়ে না যায়, বা সেটার জন্য যা পূর্বেই হারিয়েছেন, অথবা সেটার জন্য যা কিনা প্রাপ্তির আশায় স্বপ্নের জাল বুনছেন। কষ্ট পাচ্ছেন কারণ তার প্রাপ্তি এখনও হয়নি, বা মনের মাঝে বিরাজ করছে ভয়। সম্মুখীন আপনি মানুষের সবচেয়ে বড় দুশমনের আর সেটা হল রোগব্যাধির ভয়, দারিদ্র্যের ভয়, মৃত্যুভয়, একাকীত্বের ভয়। প্রতিটি এই ভয়ের আস্তানা হল আপনার মনের মাঝে, আপনার বিবেকের দ্বিধা দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশই হল এসকল ভয়। সেইসকল টানাপড়েন যেটার কেন্দ্রবিন্দু হল কেবল আপনার মনের মাঝে। লক্ষ্য করুন যে এই সকল টানাপড়েনের উৎপত্তি হয় প্রত্যাশা থেকে। যেই মানুষ যত বেশি বেপরোয়া আর হিংস্র, তার আশা প্রত্যাশাও ঠিক ততটাই উদ্ধত।

অনেক দিন আগে ঘটে যাওয়া এক গল্প বলি।

এক অভিযাত্রী এক দীর্ঘ সফরের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। গাড়ীর সাথে নিজের পশুকে বেঁধে নিয়ে নির্ধারিত সময়ের মাঝে সফর সম্পন্ন করার অভিপ্রায়ে যে পাড়ি জমালো। এই পশুটির আমরা নাম দেই 'প্রয়োজন', গাড়ীটার নাম দেই 'প্রত্যাশা', একটা চাকার নাম দেই 'সুখ' আর আরেকটার নাম দিলাম 'কষ্ট'। এভাবেই একবার ডানদিকের চাকায় আর আরেকবার বামদিকের চাকায় ভর করে নিজ গন্তব্যের দিকে অভিযাত্রী ধাবিত হতে থাকল। গাড়ীটা যত দ্রুত চলছিল, সুখ আর কষ্টের দুই চাকাও সমান তালে চক্রাকারে ঘুরছিল। যেন একই সুতোয় বাঁধা দুটি চাকা প্রত্যাশার বাহনকে নিয়ে ছুটে চলছিল সামনের দিকে। দীর্ঘ এই পথযাত্রা এত লম্বা ছিল যে এক পর্যায়ে অভিযাত্রীর মনে হতে লাগলো বুঝি তার নতুন কিছু আর করার নেই, এক ধরণের অবসাদ আর উদাসীনতা তাকে চেপে ধরল। তাই সে সিদ্ধান্ত নিল যে নিজেকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত আর জৌলুসপূর্ণ করে তুলবে এবং তাতেই সে নিজেকে ব্যস্ত করে তুলল। কিন্তু প্রত্যাশার বাহন যতই জাঁকজমকপূর্ণ হতে থাকল, প্রয়োজনের বোঝাও বেড়ে চলতে লাগলো। এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে সামনের পথে বাঁক নেবার সময় বা ঢালু পথে পা রাখতে গিয়ে নিরীহ ভারবাহী পশুটি প্রত্যাশার বাহনকে থামাতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেতে থাকল। ধুলোবালি মাখা রুক্ষ পথে চলতে গিয়ে সুখ আর কষ্টের চাকাদুটো বারবার বাঁধাগ্রস্ত হতে থাকল। এভাবেই হঠাৎ একদিন আমাদের অভিযাত্রী হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেল কারণ পথ ছিল আরও বাকি আর গন্তব্য তখনও অনেক দূর। ঐ রাতে সে মনঃস্থির করল যে ধ্যান করবে এবং ধ্যানরত অবস্থায় সে তার পুরনো বন্ধুবরের ডাক শুনতে পেল। ঐশী ধ্বনির সারমর্ম বুঝতে পেরে সে পরদিন সকালে তার বাহন থেকে সবধরনের চাকচিক্য সরিয়ে ফেলল। এতে করে বাড়তি বোঝা থেকে তার বাহন ভারমুক্ত হয়ে গেল আর খুব শীঘ্রই পশুটি দ্রুতগতিতে গন্তব্যের দিকে ছুটে চলতে লাগলো। তথাপি ঘটনাচক্রে বেশ কিছু সময় অপচয় হয়ে গেল যা পুনরুদ্ধার করা সম্ভবপর নয়। রাতের বেলা অভিযাত্রী আবারও ধ্যানে মগ্ন হল এবং তার বন্ধুর দেয়া আরেকটি উপদেশ তার বোধগম্য হল। সে অনুধাবন

করতে পারল যে এবার তাঁকে দ্বিগুণ কঠিন এক অসাধ্যকে সাধ্য করতে হবে আর সেটা হল মায়ার পিছুটান ছিন্ন করা। পরের দিন খুব ভোরবেলা উঠে সে প্রত্যাশার বাহনটাকে আলাদা করে ফেলল। বলা বাহুল্য যে এতে করে তার সুখের চাকাটা পিছে পড়ে রইল কিন্তু এটাও সঠিক যে কষ্টের চাকাটাও আর তার সহযাত্রী রইল না। প্রয়োজন নামধারী পশুটির পিঠে আরোহণ করে সে উদ্দাম গতিতে সজীব সবুজ প্রান্তরের বুক চিরে তার নিজ গন্তব্যের দিকে ছুটে চলতে থাকল।

লক্ষ্য করে দেখুন আশা প্রত্যাশা কিভাবে আমাদের কাবু করে ফেলে। বিভিন্ন রকমের আশা প্রত্যাশার বিভিন্ন রকমের প্রকারভেদ আছে। কিছু প্রত্যাশা নিতান্ত নিষ্ঠুর আর কিছু আছে আকাশচুম্বী। প্রত্যাশা বাড়ান, ছাড়িয়ে যাক আশার আকুতি,পরিশোধিত হোক প্রত্যাশার প্রাঙ্গন। এটা ঠিক যে নিশ্চিতভাবে সুখের চাকাটি হারিয়ে যাবে কিন্তু মনে রাখবেন যে কষ্টের চাকাটিও আর পিছু করবে না। প্রত্যাশা বাস্তবায়নের তাড়নায় মানুষ যে ধ্বংসাত্মক আচরণ প্রদর্শন করে তা কেবল তার বিবেকের এক ব্যাধির বহিঃপ্রকাশই নয় বরং অন্যদের সাথে তার দৈনন্দিন লেনদেনেও এই মনোভাব কাজ করে। এটা মনে করবেন না যে আমি কেবল সেই ধ্বংসাত্মক আচরণের কথা বলছি যা সামরিক কোন যুদ্ধের সময় দেখা যায়, যখন একজন আরেকজনকে ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে লিপ্ত হয়। এটা হল এক ধরণের শারীরিক সংঘর্ষ। আরেক ধরণের সন্ত্রাস হল অর্থনৈতিক যখন আপনি অন্য আরেকজনের অবস্থার ফায়দা নেন, যখন একজন আরেকজনকে লুটপাট করে খায়, যখন কেউ আর কারও ভাই নয়, যখন আপনার ভাইয়ের চোখে আপনি কেবলই এক শিকারী পাখী। আরও আছে এক ধরণের সন্ত্রাস যেটা হল বর্ণবাদী। আপনার কি মনে হয়না অন্য জাত, গোত্র বা বর্ণের কারও ব্যাপারে আপনি নিজেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত নন? ভিন্ন জাত আর বর্ণের কারণে যখন আপনি অপমানের তীরে অন্য কাউকে আহত করতে থাকেন তখন কি আপনার মনে হয়না যে আপনি ধ্বংসাত্মক কাজে জড়িত? আরেক ধরণের সন্ত্রাস হল ধর্মীয় – আপনার নিজের ধর্মের না হওার কারণে যখন আপনি কাউকে চাকরি দেয়া হতে বঞ্চিত করেন, যখন অগ্রসর হবার দ্বার রুদ্ধ করে দেন বা কাউকে চাকুরি

হতে অন্যায়ভাবে অব্যাহতি দেন, তখন আপনার কি মনে হয়না যে আপনি ধর্মীয় সন্ত্রাসে জড়িত? আপনার নিজের রীতিনীতির সাথে ভিন্নমত পোষণকারী কাউকে খুঁজে বের করে তাকে যখন আপনি অপমানিত করেন তখন কি সেটা সন্ত্রাস নয়? নিজের পরিবার, আপনজনের ভেতর থেকে খুঁজে বের করেননি এমন মানুষদের? কেন আপনার ধর্মের সাথে তার মতের অমিল? আরও এক ধরণের সহিংসতা আছে যেটা হয়ে থাকে কূপমণ্ডূক মানসিকতা আর নৈতিকতার কারণে যেটাকে ফিলিস্টিন মোরালিটিও বলা হয়। আপনি কি চান নিজের জীবনযাপনের রীতিনীতি অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে? বা নিজের অভিজ্ঞতার বোঝায় অন্যকে ন্যুজ করতে? কিন্তু আপনাকে কে বলেছে যে আপনিই সেই অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত? কে আপনাকে বলেছে আপনার ভাল লাগছে তাই বলে আপনি নিজের ধ্যানধারণা অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবেন? কোথায় সেই অনুকরণীয় মডেল আর কোথায়ই বা সেই ব্যক্তি যার কারণে আপনি নিজমত অন্যের ওপর চাপাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন? এটাই হল আরও এক ধরণের সহিংসতা যেটার সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিলাম। নিজের মাঝে এবং অন্যের সাথে সহিংসতা সন্ত্রাস নির্মূল করার একমাত্র উপায় হল অন্তরের বিশ্বাস আর ধ্যান বা মেডিটেশন। এই পৃথিবী বিস্ফোরিত হতে আর বাকি নেই এবং সন্ত্রাস সহিংসতা বন্ধের আর আসলেই কোন উপায় নেই। মিছে দরজার কড়া নেড়ে কোন লাভ নেই। উশৃঙ্খল এই সন্ত্রাস সহিংসতা নির্মূল আর প্রতিরোধ করতে পারে এমন কোন নীতিই প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। এই পৃথিবীতে সন্ত্রাস বন্ধ করতে পারে এমন কোন দল বা কোন আন্দোলন কোনটাই নেই। বিশ্বে মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়া এই সহিংসতা থেকে পালিয়ে বাঁচার কোন মিথ্যা ফটক খোলা নেই। আমাকে জানানো হয়েছে যে পৃথিবীর নানান প্রান্তের তরুন প্রজন্ম এই সহিংসতা আর নিজের মনের টানাপড়েন থেকে নিস্তার পাবার প্রয়াসে মিথ্যে সব দুয়ারের কড়া নেড়ে চলেছে। মাদকের মাঝে তারা খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে পরিত্রাণ। সহিংসতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য মিছে এসব দ্বার থেকে দূরে সরে আসুন।

ভাই আমারঃ সহজ সরল নীতি অনুসরণ করুন, এই পাথর, এই তুষার আর এই সূর্যের রশ্মির মত যা আমাদের কত উপকার করে।

নিজের মাঝে শান্তি নিয়ে আসুন এবং অন্যের মাঝে সেই শান্তি ছড়িয়ে দিন। ভাই আমারঃ ইতিহাসের পাতায় তাকিয়ে দেখুন, সহিংসতা আর কষ্টের কি ভয়ানক রূপ তা দেখে নিন আরেকবার, দেখুন কষ্ট দেখতে কিরকম। তবে মনে রাখুন যে সামনে এগিয়ে চলাটা অপরিহার্য, হাসতে শেখাটা এবং ভালবাসতে শেখাটাও খুবই জরুরী।

এবার আপনার পালা ভাই আমারঃ আমি ছুঁড়ে দিলাম আপনার দিকে এই আশার আলো, সুখের এই প্রত্যাশা, ভালবাসার এক প্রত্যাশা যেন আপনি নিজ মস্তিষ্ক আর হৃদয়কে বিকশিত করতে পারেন, এবং একইসাথে নিজের এই নশ্বর দেহকেও বিকশিত করতে ভুলবেন না যেন।

নোটঃ

1. *আর্জেন্টিনার সামরিক স্বৈরশাসনের আমলে কোন শহরে জনসভা আয়োজন করা ছিল নিষিদ্ধ। পর্যায়ক্রমে, পুন্তা দে বাকাস নামে চিলি আর আর্জেন্টিনার সীমান্তের কাছে এক নির্জন স্থানকে বেছে নেয়া হয়েছিল এই বিবৃতি দানের জন্য। অনেক দিন ধরেই সামরিক জান্তা সড়কপথে সবার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে আসছিল। সামরিক বাহন, মেশিন গানের বহর আর সামরিক বাহিনীর লোকজন, কোন কিছুই তাদের নজর এড়িয়ে যেতে পারতনা। কোথাও যাবার জন্য ব্যক্তিগত পরিচয় আর কাগজপত্র দেখাতে হত এবং এ কারণে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের সাথে যথেষ্ট গরমিল তৈরি হয়েছিল। তুষার ঢাকা পর্বতমালাকে পেছনে রেখে এক রৌদ্রোজ্জ্বল শীতের দিনে শ দুয়েক লোকের সামনে সিলো তার বিবৃতি প্রদান করা শুরু করেন। মাঝরাত হবার আগেই সবকিছু সম্পন্ন হয়।*

2. *এটাই ছিল সিলোর প্রথম জনসভা। কাব্যিক ভাব প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তিনি এটাই বলতে চেয়েছেন যে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ('প্রকৃত জ্ঞান') তা কিন্তু কোন বইয়ের মলাটের মাঝে বা প্রকৃতির কোন নিয়মের জালে বাঁধা নয়। বরং এটা*

একান্ত ব্যক্তিগত এবং অন্তরঙ্গ একটি অভিজ্ঞতা। কষ্টের অনুধাবন এবং তা থেকে মুক্ত হবার যে পরিক্রমা সেটা জানতে পারাটাই হল জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান।

এই যুক্তির সমর্থনে তিনি কিছু সহজ নীতি পেশ করেন ১) প্রথমেই এটা বুঝে নিতে হবে যে শারীরিক কষ্ট এবং তা থেকে হওয়া অনুভূতিগুলো কিরকম। বিজ্ঞানের বিকাশ আর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারলে এই ধরণের কষ্ট থেকে নিস্তার পাওয়া যেতে পারে সেটাও মাথায় রাখতে হবে। কিন্তু আরেক ধরণের কষ্ট হল মানসিক যেটা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বিজ্ঞান বা ন্যায়বিচার কোনটাই ফলপ্রসূ হবে না ২) মানুষ তিনভাবে কষ্ট পেতে থাকে, তার দৃষ্টিভঙ্গি, তার স্মৃতি আর তার কল্পনাশক্তির কারণে ৩) এই কষ্ট এক ধরণের সহিংসতার বহিঃপ্রকাশমাত্র ৪) এই সহিংসতার মূল কারণ হল প্রত্যাশা ৫) প্রত্যাশার নানান স্তর এবং আকার রয়েছে। মেডিটেশনের মাধ্যমে এই অনুভূতিগুলোর মোকাবেলা করা সম্ভব। সুতরাং ৬) প্রত্যাশা (যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় সেখান) থেকে জন্ম নেয়া সহিংসতা নিজের মধ্যে ধরে রাখা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায় আর তখনই তা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভেতর দিয়ে সঞ্চারিত হতে থাকে ৭) বিভিন্ন ধরণের সহিংসতা আমাদের মাঝে বিরাজ করে এবং সব সহিংসতাই শারীরিক নয় ৮) জীবনকে সরল পথে চালিত করে এমন কিছু মূলমন্ত্র থাকা জরুরী ('সহজ সরল কিছু জীবনের রীতিনীতি' – শান্তি বজায় রাখা, সুখী থাকা এবং সর্বোপরি আশাবাদী হওয়া।

উপসংহার – বিজ্ঞানের বিকাশ আর ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা মানবজাতির কষ্ট লাঘবের জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু একমাত্র আদিম আকাঙ্খা আর প্রত্যাশার দমনের মাধমেই মানসিক পীড়া থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব।

অন্তর চাহনি
La Mirada Interna

I. মেডিটেশন

1. জীবনে অনুভূতিহীন হয়ে থাকা কিভাবে জীবনকে পরিপূর্ণতার অনুভূতিতে ভরিয়ে তোলে সেটা এখানে তুলে ধরা হবে।

2. এখানে আছে সুখ, দেহের প্রতি অনুরাগ, প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা, মানবতা আর বিবেকের প্রতি মমত্ববোধ

3. এখানে আত্মত্যাগ করা লাগে না, অপরাধবোধ আর কবরের ভয় থেকে মুক্ত থাকা যায়

4. এখানে যে পার্থিব সে শাশ্বতর বিরোধিতা করে না

5. যারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে ধ্যানমগ্ন হয়ে কিভাবে অন্তরের এক অনুপম অভিব্যক্তি লাভ করা যায় সে ব্যাপারে এখানে কথা বলা হবে

II. বুঝতে চাইবার সাগ্রহ ইচ্ছা

1. আমি জানি আপনি কি অনুভব করছেন কারণ আমি জানি আপনার অবস্থা কি, কিন্তু আমি যা আপনাকে বলব সেটা আপনি হয়তবা সহজে অনুধাবন করতে পারবেন না। সেকারণে মানুষকে কি সুখী করে আর কিসে সে মুক্তি পায় সে ব্যাপারে যদি আপনাকে আমি কথা প্রসঙ্গে দুটো কিছু বলি তাহলে সেটা বোঝার চেষ্টা করাটা বৃথা যাবে না।

2. এটা মনে করলে ভুল হবে যে আমার সাথে তর্ক করলে আপনি সব বুঝে যাবেন। যদি মনে হয় যে আমার কথার পিঠে কথা বললেই সব কিছু পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন তাহলে সেটা করতে পারেন কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে এমনটা করলে যে পথ আমরা অনুসরণ করতে চাই তা আমরা খুঁজে পাবনা।

3. যদি আমাকে এই প্রশ্ন করেন যে কি ধরণের মনোভাব নিয়ে এগোতে হবে তাহলে আমি বলব যে গভীরভাবে এবং অবিচলিতভাবে ধ্যানে মগ্ন হতে হবে।

4. যদি আপনি উত্তর দেন যে আপনার আরও জরুরী কাজ আছে, তবে আপনার ঘুমাবার বা মারা যাওয়ার ইচ্ছা হিসেবে আমি প্রত্যুত্তরে বলব যে আমি আপনার বিরোধিতা করে এমন কিছুই করব না।

5. আমি কিভাবে ব্যাপারগুলো পেশ করছি সেটা পছন্দ না হলে অভিযোগ করেও লাভ নেই কারণ ফলের স্বাদ যদি পছন্দ হয় তবে ফলের ছিলকে নিয়ে অভিযোগ না করলেও চলবে।

6. আমার কাছে যেটা সমীচীন মনে হবে আমি সেটাকেই সামনে তুলে ধরব। অন্তরের সত্যবাণী থেকে শত মাইল দূরে সরে গিয়ে যারা কিছু লাভ করতে চায় তাদের মনরক্ষা করার জন্য কিছুই আমি বলব না।

III. অর্থহীনতা

অনেক দিন ধরেই আমি এক বিচিত্র ধাঁধাঁর সম্মুখীনঃ যারা মনের মাঝে ব্যর্থতার বোঝা বয়ে বেড়ায় তারাই শেষমেশ বিজয়ী হুঙ্কার ছুঁড়তে পারে, আর যারা সারাক্ষণই বিজয়ীবেশে পদচারণ করে বেড়ায় তাদের জীবন নিস্তেজ, ঝিমিয়ে পড়া শাকসবজির মতই নিরস। অনেক সময় এমনটা হয়েছে যে আমি তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার থেকে আলোর দেখা পেয়েছি জ্ঞানের মাধ্যমে নয়, ধ্যানের মাধ্যমে।

তাই প্রথম দিনে আমি নিজেকে বললাম যেঃ

1. জীবন অর্থহীন যদি মৃত্যুই সব কিছুর পরিসমাপ্তি হয়।

2. প্রতিটি পদক্ষেপের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, তা নিন্দনীয়ই হোক বা প্রশংসনীয়, সর্বদাই এক শূন্যতার দিকে ধাবিত করে।

3. ঈশ্বর এমন কিছু যেটা নিরাপদ নয়।

4. বিশ্বাস যুক্তি আর স্বপ্নের মতই পরিবর্তনশীল

5. "যা কাউকে করতেই হবে" এমন কিছু পুরোপুরিভাবে আলোচনাসাপেক্ষ এবং বিস্তারিত বিবরণের সমর্থনে কোন যুক্তি নাও থাকতে পারে।

6. "যেই দায়িত্ববোধ" নিয়ে কেউ কোন কিছুর ব্যাপারে অঙ্গীকার করে সেটা যে ব্যক্তি অঙ্গীকারই করে না তার থেকে বেশী বড় নয়।

7. আমি আমার ইচ্ছানুযায়ী চলি এবং এর মানে আমি ভীরু নই, আমি বীর।

8. "যে বিষয়ে আমি আগ্রহী" তা কোন কিছুরই পক্ষে বা বিপক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্য নয়।

9. "আমার যুক্তিতর্ক" অন্যের চেয়ে ভালও নয় খারাপও নয়

10. নিষ্ঠুরতা আমাকে ভীত করে কিন্তু সেটা নিজের আঙ্গিকে মমতার চেয়ে ভাল বা খারাপ কোনটাই নয়।

11. যা বলার আজই বলছি, নিজের ও অন্যের জন্য, আগামীকালের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

12. মৃত্যু জীবনের চাইতে বা জন্ম নেবার চাইতে ভালও নয়, আবার খারাপও নয়।

13. বুঝতে পেরেছি জ্ঞানের মাধ্যমে নয়, বরং অভিজ্ঞতা আর ধ্যানের মাধ্যমে যে মৃত্যুই যদি হয় সবকিছুর পরিসমাপ্তি তবে এমন জীবন কেবলই অর্থহীন।

IV. নির্ভরশীলতা

দ্বিতীয় দিনঃ

1. আমি যা করি, অনুভব করি বা ভাবি, তা আমার ওপর নির্ভর করে না।

2. আমি পরিবর্তনশীল এবং মাধ্যমের ক্রিয়াকলাপের ওপর নির্ভরশীল। যখন আমি এই মাধ্যমকে বা নিজেকে পরিবর্তনের চেষ্টা করি তখন উল্টো মাধ্যমই আমাকে বদলে ফেলে। তখন আমি কোন শহর বা প্রকৃতির কোলে নীড় খুঁজে ফিরি, সন্ধান করতে থাকি সামাজিক কোন প্রায়শ্চিত্তের বা আমার জীবনের অস্তিত্বকে প্রতীয়মান করে এমন কোন নতুন চ্যালেঞ্জের। এই প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই মাধ্যম নির্ণয় করে আমি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করব। এভাবেই সেই মাধ্যম এবং আমার আগ্রহের পরিণতিতে আজ আমি এখানে।

3. সুতরাং এটাই বলতে চাই যে কে সিদ্ধান্ত নিল বা কি সিদ্ধান্ত নেয়া হল কোনটাই জরুরী নয়। এমস্তাবস্থায় এটাই বলতে পারি যে আমাকে বাঁচতে হবে, কারণ আমি বেঁচে থাকার মত অবস্থায় আছি। আমি এসব বলছি কিন্তু এর সমর্থনে আমার কোন যুক্তিতর্ক নেই। আমি নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারি, ইতস্তত করব নাকি থেকে যাব। যাইহোক কিছু জিনিস ভাল কিছু জিনিস খারাপ, কিন্তু সবই সাময়িক। আসলে "ভাল" বা "খারাপ" বলে চূড়ান্তভাবে কিছুই নেই।

4. কেউ যদি আমাকে বলে যে খেতে না পেলে যে কেউ মৃত্যুবরণ করবে। আমি তাকে বলব যে তা সঠিক কারণ ক্ষুধার তাড়নায় তাড়িত হয়ে জীবনধারণের জন্য খাদ্যগ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি এটা বলবনা যে খাওয়ার জন্যই বেঁচে থাকা উচিত। আমি এটাও বলব যে নিঃসন্দেহে এটা ভাল না। খুব সরল্ভাবে আমি বুঝিয়ে বলতে পারি যে জীবনধারণের জন্য ক্ষুধা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত একটা চাহিদা বৈকি কিন্তু যেই মুহূর্তে শেষ যুদ্ধে মানুষ পরাজিত হয় ঠিক তখনই সেটার আর কোন অর্থ থাকে না।.

5. আমি আরও বলব যে যারা দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করছেন, যারা নিপীড়িত আর নির্যাতিত, তাদের সাথে আমি সহমর্মী। তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলে আমি "সার্থক" বোধ করি কিন্তু আমি এটাও বুঝে নেই যে কোনকিছুই সেটার ন্যায্যতা প্রমাণ করতে পারবেনা।

V. অনুভূতিকে সন্দেহ করা

তৃতীয় দিনঃ

1. কখনও কখনও আমি কিছু ঘটনা অনুমান করতে পেরেছি যা পরবর্তীতে আসলেই ঘটেছিল

2. কখনও কখনও আমি অনেক দূরের কোন চিন্তা ভাবনায় ডুবে গেছি

3. কখনও কখনও আমি এমন কিছু স্থানের বিবরণ দিয়েছি যেখানে অতীতে কখনও যাইনি

4. কখনও কখনও আমি আমার অনুপস্থিতিতে কি কি ঘটেছিল তা সুনিপুণভাবে বলে দিতে পারি

5. কখনও কখনও আমি অনাবিল আনন্দের জোয়ারে প্লাবিত হয়েছি

6. কখনও কখনও কোন বিষয়ে সামগ্রিক একটি উপলব্ধি আমাকে পুরোপুরিভাবে গ্রাস করেছে

7. কখনও কখনও নিখুঁত কিছু জিনিসের সম্মিলন আমাকে বিমোহিত করেছে

8. কখনও কখনও আমি আমার স্বপ্নগুলোকে চুরমার করে দিয়েছি এবং নতুন আলোকে বাস্তবতা দেখতে শিখেছি

9. কখনও কখনও আমি এমন কিছু প্রথম বার দেখেছি কিন্তু দেখে মনে হয়েছে আগেও অনেকবার দেখেছিলাম

...আর এসবই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। যথার্থ উপদেশ আমি এই দিতে পারি যে এসব অভিজ্ঞতাগুলো না হলে আমি অনুভূতিহীনতা থেকে বের হতে পারতাম না।

VI. স্বপ্ন এবং জেগে ওঠা

৪র্থ দিনঃ

1. যা আমি স্বপ্নে দেখি বা আধো ঘুম আধো জাগ্রত অবস্থায় দেখি, এমন কি পুরোপুরি সজাগ অবস্থায়ও স্বপ্ন যখন দেখতে থাকি, তার কোনটাকেই বাস্তব হিসেবে মেনে নেয়া যাবে না।

2. কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় যা আমি কোন স্বপ্ন দেখা ছাড়াই দেখতে পাই সেটাকে সত্যি হিসেবে ধরে নেয়া যায়। এর অর্থ আমার ইন্দ্রিয়গুলো যেসকল অনুভূতিগুলোকে অনুভব করছে সেটা নয়, বরং ঐ সময়ে আমার মস্তিষ্ক কি ধরণের তথ্য বিশ্লেষণ করছে সেটাই মুখ্য। কারণ আমাদের বাইরের আর ভিতরের ইন্দ্রিয় আর স্মৃতিশক্তিই আমাদের সাদামাটা আর সন্দেহজনক তথ্য প্রদান করে থাকে। সত্যি কথা বলতে আমি যখন জাগ্রত থাকি তখন আমার মন তা জানে আর আমি যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন আমার মন তা মেনেও নেয়। খুব কম সময়ই আমি বাস্তবতাকে নতুন আঙ্গিকে দেখতে পেরেছি এবং পরবর্তীতে বুঝতে পেরেছি যে যা আমি দেখেছি তা আসলে স্বপ্ন বা আধ-জাগা স্বপ্নের মত।

প্রকৃত অর্থে সজাগ থাকার আসল একটি উপায় আছে। এই উপায়ের সহায়তায় উপরে বর্ণীত বিষয়গুলো নিয়ে আমি গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলাম। এছাড়া এর কারণেই এই বিশ্বে বিরাজমান সব কিছুর অস্তিত্বের প্রকৃত অর্থের এক বিস্ময়কর দ্বার আমার সামনে উম্মুক্ত হয়েছে।

VII. শক্তির উপস্থিতি

৫ম দিনঃ

1. যখন আমি সত্যিকার অর্থে জাগ্রত ছিলাম তখন এক স্তরের বোধিলাভ থেকে আরেক উঁচু স্তরের বোধিলাভ করে চলেছি

2. যখন আমি প্রকৃত অর্থে জেগে উঠেছিলাম এবং অনুভব আর অনুধাবনের এই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে যখন ক্লান্ত বোধ করতাম তখন আমি আমার নিজের মাঝেই শক্তি খুঁজে পেয়েছি। এই শক্তি ছিল আমার সমস্ত শরীর জুড়ে, দেহের প্রতিটি কোষে নিহিত ছিল এই শক্তি, ধমনীতে বয়ে চলা রক্তের চাইতেও দ্রুত আর গভীর ছিল এই শক্তি।

3. আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি যে যখন শরীরের কোন অংশ সক্রিয় ছিল এই শক্তি ঠিক সেখানেই কেন্দ্রীভূত হয়ে ছিল, আর শরীরের যে অংশ নিষ্ক্রিয় ছিল সেখানে এই শক্তিও ছিল অনুপস্থিত।

4. যখন শরীর খারাপ ছিল তখন এই শক্তি দেহের ঠিক ঐ জায়গা গুলোতেই কেন্দ্রীভূত ছিল যেখানে ছিল রোগের বসবাস। যখনই এই শক্তি আমার দেহের ভেতর দিয়ে তার নিজের বয়ে চলার পথ খুঁজে পেয়েছে তখনই নানান রোগের উপশমও হয়েছে।.

অনেকেই আছে যারা জানে যে কিভাবে এই শক্তি বিভিন্ন উপায়ের মাধ্যমে পুনর্বহাল করতে হয় তথাপি আমরা অনেকেই এর ব্যাপারে ওয়াকিবহাল নই।

অনেকে আছে যারা এটা জানে এবং তারা অন্যকেও এই শক্তির ব্যাপারে অবগত করে। এভাবে এক ধরণের অনুধাবন "দ্যুতি" উৎপন্ন হয় এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে শারীরিক "অলৌকিক" ঘটনারও সূত্রপাত হতে পারে।

VIII. শক্তির নিয়ন্ত্রণ

৬ঠ দিনঃ

1. দেহের ভেতর দিয়ে বয়ে চলা এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ এবং কেন্দ্রীভূত করার কিছু নিয়ম আছে।

2. শরীরে কিছু নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র আছে। এটা নির্ভর করে আমাদের চলাফেরা, আবেগ আর বুদ্ধিবৃত্তির ওপর। যখন শক্তি এই জিনিসগুলোর ওপর প্রভাব ফেলে তখন আমাদের চলাফেরা, আবেগ আর মননশীল কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়।

3. এই শক্তি কি শরীরের গহীনে নাকি বহিরাবরণে বিরাজ করছে তার ওপর নির্ভর করে যে ব্যক্তি স্বপ্নের ঘোরে, আধো স্বপনের ঘোরে নাকি সম্পূর্ণরূপে সজাগ থাকবে । নিশ্চয়ই আমরা ধর্মীয় বিভিন্ন শিল্প ও চিত্রকর্মে সাধুপুরুষদের (বা বোধি লাভকারী মহাত্মাদের) দেহ এবং মস্তকের চারিপাশে এক ধরণের ঐশী আভা দেখতে পেয়েছি এবং এটা এই শক্তির বাহ্যিক নিদর্শন ছাড়া কিছুই নয়। .

4. প্রকৃতরূপে জাগ্রত হবার একটি কেন্দ্রস্থল আছে এবং এই শক্তিকে সেই পথে চালিত করার উপায়ও আছে।

5. যখন এই শক্তিকে এই বিশেষ কেন্দ্রস্থলে ঘনীভূত করা হয় তখন দেহের অন্যান্য শক্তির কেন্দ্রবিন্দুগুলো রদবদল হয়ে যায়।

বিশেষ এই শক্তির সঞ্চালন এবং সেই কেন্দ্রস্থলের উপস্থিতির রহস্য অনুধাবন করতে পেরে আমি আমার ভেতর প্রলয়ঙ্করী এক বলের প্লাবন অনুভব করতে পেরেছি এবং সেটা আমার বিবেককে ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে গেছে। আমি বোধ শক্তির এক স্তর থেকে আরেক উঁচু স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলাম। যদিও আমি লক্ষ্য করেছি যে যখনই আমি এই শক্তির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম তখনই আমি আমার মনের সর্বনিম্ন এক গহীন অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিলাম। স্বর্গ আর নরকের যত কেচ্ছা-কাহিনী শুনেছিলাম তা মনে পড়ে গিয়েছিল আর আমি এই দুই মানসিক অবস্থার মাঝের সেই সূক্ষ্ম বিভাজন রেখাটাও দেখতে পেয়েছিলাম।

-

IX. শক্তির বহিঃপ্রকাশ

৭ম দিনঃ

1. এই চলমান শক্তি দেহ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েও নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে

2. এই সম্মিলিত শক্তি দ্বৈত শরীরের একটি বিশেষ রূপ, দেহের গহীন অন্তঃস্থলে এর বহিঃপ্রকাশ। এই বিশেষ অন্তঃস্থল এবং শরীরের মাঝে অনুভূত ঐশী বোধের ব্যাপারে মানসিক ঘটনাবলীর বিজ্ঞানের আলোকেও তেমন বিশেষ কোন কার্যকরী তথ্য বিশ্লেষণ পাওয়া যায়নি।

3. উদ্ভাসিত এই শক্তি (ধারণা করা হয়েছিল যেটা কিনা শরীরের বাইরে থেকে উৎপন্ন হয়েছিল এবং মৌলিক ভিত্তি থেকে তা ছিল পৃথক) একটা ছবির মত বিলীন হয়ে চলেছিল অথবা সঠিকভাবেই প্রকট হয়েছিল। এর পুরোটাই নির্ভর করছিল আভ্যন্তরীণ মৌলিক ভিত্তির ওপর যেটা কিনা ব্যক্তিকেও চালিত করে।

4. আমি এটা বুঝতে পারছিলাম যে এই শক্তির বহিরাবস্থান, অর্থাৎ অনুভব করতে পারা যে এই শক্তি শরীরের বাইরে অবস্থান করছে, কিন্তু এর অবয়ব নিজের শরীরের মতনই, এই পুরো অনুভূতিটাই মস্তিষ্কের সর্বনিম্ন স্তর থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। জীবনের মৌলিক অস্তিত্ব যখন হুমকির সম্মুখীন হয় তখন এই ধরণের প্রতিরক্ষাকারী প্রতিক্রিয়া অনুভূত হওয়াটাই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। একারণে অন্য আরেক মানসিক স্তরে বিরাজমান অবস্থায় সজাগতার পরিমাণ যদি কম হয় এবং অভ্যন্তরীণ একাত্মবোধের যদি ঘাটতি থাকে তবে নিজের অজান্তেই ব্যক্তি এক ধরণের উত্তর অনুভব করতে পারে, সে জানেও না যে সে স্বয়ং সেসকল ক্রিয়াকাণ্ডের হোতা এবং এটাকে বেশীরভাগ সময়েই অন্য কোন আধ্যাত্মিক শক্তির ওপর চালিয়ে দেয়া হয়।

"ভূত" বা "প্রেতাত্মা" বা গণকরা আসলে ব্যক্তির দ্বিতীয় একটি রূপমাত্র (তাদের নিজেদেরই বহিঃপ্রকাশ) এবং তাদের মনে হতে থাকে যে তারা ঐ দ্বিতীয় রূপ দ্বারা বশীভূত হয়ে গেছে। শক্তির ওপর

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার কারণে যেহেতু তাদের মানসিক অবস্থা তমসাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল (অলৌকিক ঘোরে) তাদের মনে হচ্ছিল তারা যেন এই বিচিত্র কোন শক্তির নিয়ন্ত্রণে চালিত হচ্ছিল এবং প্রায় সময়ই তারা চমকপ্রদ কিছু অলৌকিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল। বলা বাহুল্য যে বেশ কিছু "বশীভূত" ব্যক্তিরাই এমন অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছে। এর সারমর্ম হল এই বিশেষ শক্তির নিয়ন্ত্রণ।

এটা আমার চলমান জীবন এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের ব্যাপারে ধারণা সম্পূর্ণভাবে বদলে দিয়েছে। এসকল চিন্তাভাবনা আর অভিজ্ঞতার প্রভাবে মৃত্যুকে আমি যেমন আর বিশ্বাস করি না ঠিক তেমনি জীবনের অর্থহীনতাও আমি আর বিশ্বাস করিনা।

X. অনুভূতির প্রমাণ

৮ম দিনঃ

1. জাগ্রত এক জীবনের গুরুত্ব আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে

2. অভ্যন্তরীণ সব দ্বিধা-দ্বন্দের অবসান ঘটানো যে কত জরুরী সে ব্যাপারে আমি বুঝতে পেরেছি

3. ঐক্য এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এই বিশেষ শক্তির নিয়ন্ত্রণ করা যে কত গুরুত্বপূর্ণ সেটা বুঝতে পেরে আমার মন ফুরফুরে এক আনন্দে ভরে গিয়েছে

XI. আলোকিত কেন্দ্রবিন্দু

৯ম দিনঃ

1. এই শক্তির ছিল আলোকিত রূপ এবং একটি কেন্দ্রস্থল থেকে এর উৎপত্তি

2. এই শক্তি যখন বিলীন হয়ে যেতে থাকে তখন ঐ কেন্দ্রবিন্দু হতে তার দূরত্বও বাড়তে থাকে এবং ঐ শক্তি যখন আবার ঘনীভূত হয়ে একত্রিত হতে থাকে তখন ঐ কেন্দ্রবিন্দুও একই অনুপাতে পরিবর্তিত হতে থাকে

আমি আর এটা দেখে অবাক হইনা যে প্রাচীন কিছু গ্রামাঞ্চলে অনেকেই সূর্যদেবের উপাসনা করে এবং আমি আরও দেখেছি যে অনেকেই আছে তারা-নক্ষত্রের সামনে মাথা নোয়ায়। তাদের বিশ্বাস এই তারকারাশি এই পৃথিবীর আর প্রকৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে, অন্যদিকে কিছু গোষ্ঠীর ধারণা এসব কিছু আরও বড় কোন বাস্তবতার প্রতীকমাত্র।

ওদিকে অনেকেই আছে যারা এই বিশেষ কেন্দ্রস্থল থেকে অগণিত সব ঐশী ক্ষমতা লাভ করেছে। অন্তরে যার অনুপ্রেরণা, ভক্তি আর ভয়, তার প্রতি নেমে এসেছে এই ক্ষমতা অগ্নিবাণীর মত, কখনও বা আলোকের গোলকের মত, আবার কখনও জ্বলন্ত কোন ঝোপের মত।

XII. অনুভবের আবিষ্কার

১০ম দিনঃ

আমার অনুভূতির আবিষ্কারগুলো গুটিকয়েক কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ, এর সারমর্ম নীচে তুলে ধরছিঃ

1. এই শক্তি শরীরের ভেতর দিয়ে নিজে নিজেই সঞ্চালিত হতে থাকে। যদিও সচেতন এবং প্রত্যক্ষভাবে এটাকে পরিচালিত করা সম্ভব। সুনিপুণভাবে এবং সচেতন হয়ে এই শক্তিকে পরিচালনা করতে পারার অনুভূতি মানুষকে তার বিবেকের

ওপর চাপিয়ে দেয়া প্রাকৃতিক বিভিন্ন দায়বদ্ধতার অনুভূতি থেকে অনাবিল মুক্তির স্বাদ প্রদান করতে পারে

2. বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শরীরের বিভিন্ন অংশে কিছু কেন্দ্রস্থল রয়েছে

3. প্রকৃত অর্থে সজাগ হয়ে থাকা আর শুধুই জেগে থাকার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে

4. এই শক্তিকে প্রকৃত সজাগ সেই স্থানে আরোহণ করিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। (এখানে শক্তি বলতে সেই মানসিক বলের কথা বলছি যেটা কিনা মনের মাঝে দেখতে থাকা নানা প্রতিচ্ছবির মূল চালিকা বল এবং স্থান মানে বলতে চাইছি সেই সকল প্রতিচ্ছবি মন-মস্তিষ্কের যে বিশেষ কেন্দ্রবিন্দুতে বহিঃপ্রকাশ করে সেটা)।

আদিম যুগের জনগোষ্ঠীর নানান ভক্তি-উপাসনার মাঝে আমি আমার এই উপসংহার খুঁজে পেয়েছি। যাবতীয় সব রীতিনীতি আর পূজাপার্বণের ভিড়ে যে সত্যির বীজ লুকিয়ে ছিল তা হল এই যে অভ্যন্তরীণ বিকাশ আর অভিব্যক্তির কোন সুযোগ তাতে ছিল না। এমন এক বিকাশ আর উপলব্ধি যা কিনা একাগ্র নিষ্ঠার বলে ব্যক্তিকে উদ্ভাসিত এক দ্যুতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। পরিশেষে বলব যে আমার অনুভূতির আবিষ্কারগুলো তারাও খুঁজে পাবে যারা একাগ্র চিত্তে সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে নিজ হৃদয়ের অন্তঃস্থলে আলোর দিশা খুঁজে বেড়াবে।

XIII. মূলনীতি

অন্তরের কিছু উপলব্ধি বজ্রপাতের মত যখন মনের গহীনে আঘাত করে তখন জীবন আর জিনিসের প্রতি দৃষ্টিবোধ অন্যরকম লাগে।

ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে, যা বর্ণীত হয়েছে সেটা ভাবতে ভাবতে ধ্যানে মগ্ন হয়ে এবং নিজেকে তা বারবার বলতে বলতে অর্থহীন যা কিছুকে অর্থ দান করা সম্ভব। নিজ জীবন নিয়ে যা করছেন তা পৃথক কিছু নয়। কিছু নিয়মের কাছে সমর্পিত হয়ে জীবনের সামনে কিছু

সম্ভাবনার দ্বার উম্মোচিত রয়েছে যেটাকে লুফে নেয়া সম্ভব। আমি স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলছি না, বরং মুক্তি, চলমান থাকা আর প্রক্রিয়া-প্রণালীই হল আমার কথা বলার মূল বিষয়। আমি এমন কোন মুক্তির কথা বলছি না যেটা স্থির, বরং এমন এক মুক্তির কথা বলছি যেটার প্রতি ধীর পদক্ষেপে সঠিক পথ অনুসরণ করতে করতে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে নিজ সেই গন্তব্যের দিকে। সুতরাং "কি করণীয়" তা কোন দূরবর্তী, অবোধ্য বা প্রচলিত কোন নৈতিক মূল্যবোধ নয়, বরং এটা নিছক কিছু নিয়মঃ জীবনের নিয়ম, আলোর আর বিবর্তনের নিয়ম।

অভ্যন্তরীণ একাত্মতার সন্ধানে সহযোগিতা করতে পারে এমন কিছু "মূলনীতি" আমি পেশ করতে পারিঃ

1. বিবর্তন ধারার বিপরীতে চলার অর্থ নিজ বিরুদ্ধে চলা
2. কোন কিছু হাসিল করার জন্য বেশী বল প্রয়োগ করলে এর বিপরীতটাই ঘটে
3. বিশাল কোন শক্তিকে রুখে দেয়ার চেষ্টা করার দরকার নেই। ঐ শক্তি থিতিয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, পরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যান
4. যখন সব কিছু তালে তাল মিলিয়ে চলতে থাকে তখন সবচেয়ে ভাল অবস্থায় থাকে, উল্টো অবস্থায় নয়
5. যদি মনে হয় যে দিন হোক বা রাত হোক, শীত হোক বা গ্রীষ্ম আপনি ভালই আছেন, তবে ধরে নিন আপনি বৈপরীত্যকে জয় করেছেন
6. যদি আপনি সুখ আর ভোগের সন্ধানে ধাবিত হতে থাকেন তবে কেবলই দুঃখকষ্টের বেড়াজালে জড়াতে থাকবেন। তথাপি শরীরের ক্ষতি করে না এমন কিছু সামনে উপস্থিত হলে মন জুড়ে সেটা উপভোগ করতে দোষ নেই
7. যদি কোন সমাপ্তির সন্ধানে ছুটে বেড়ান তবে নিজেকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ফেলবেন। মুক্তি লাভ করবেন তখনই যখন সকল কর্মকাণ্ডকে তার নিজের মাঝেই এক ধরণের পরিসমাপ্তি হিসেবে ধরে নিবেন
8. নিজের দ্বিধা-দ্বন্দের অবসান ঘটবে যখন এগুলোর সর্বশেষ মূল কারণটি বোধগম্য হবে, যখন তা সমাধান করতে চাইবেন তখন নয়

9. যখন অন্য কাউকে আহত করবেন তখন নিজেকে শেকলে জড়াবেন। যখন অন্য কাউকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকবেন তখন স্বাধীনভাবে ইচ্ছামাফিক কাজে জড়াতে পারবেন
10. আপনি যেভাবে চান যেন অন্যরা আপনার সাথে ব্যবহার করুক আপনি নিজেও সেভাবে তাদের সাথে ব্যবহার করলে নিজেকে মুক্ত করতে পারবেন
11. কোন ঘটনার পক্ষে বা বিপক্ষে কেউ আপনাকে ঠেলে দিল এটা জরুরী নয়, যেদিন আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি নিজে থেকে কোন পক্ষই নেননি সেটাই হল মুখ্য বিষয়
12. পরস্পরবিরোধী অথবা একত্রিত করে এমন কর্মকাণ্ড আপনার মধ্যে জমা হতে থাকবে। যদি নিজের অভ্যন্তরীণ একাত্মতার কাজগুলো বারবার করতে থাকেন তখন কিছুই আপনাকে থামাতে পারবে না

যখন কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবেন না তখন প্রকৃতির এক প্রবল শক্তির মত ধাবিত হবেন। জটিলতা, সমস্যা আর অসুবিধার পার্থক্য বুঝতে শিখুন কারণ এসবই হল বৈপরীত্য। যদি এগুলো আপনাকে উত্তেজিত বা প্রভাবিত করে ফেলে তখন এক বন্ধ চক্রে ঘুরপাক খেতে থাকবেন।

যখনই মনের মাঝে বিশাল কোন শক্তি, আনন্দ বা ভাল কোন অনুভূতির মুখোমুখি হবেন বা যখনই নিজেকে মনে হবে মুক্ত আর সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে স্বাধীন ঠিক তখনই নিজের অন্তরের সত্ত্বাকে ধন্যবাদ জানান। যদি এর বিপরীতটা ঘটে তবে মনে বিশ্বাস রেখে মঙ্গল কামনা করুন এবং দেখবেন যে মনের মাঝে জমতে থাকা সকল কৃতজ্ঞতাবোধ নেতিবাচকতাকে ইতিবাচক পরিণতিতে রুপান্তর করে আপনার সামনে মেলে ধরবে।

XIV. মনের অভ্যন্তরীণ পথ প্রদর্শন

এপর্যন্ত যা ব্যাখ্যা করলাম তা বুঝে থাকলে ছোট্ট একটা পরীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন এই শক্তির বহিঃপ্রকাশ। তথাপি এর অর্থ এই নয় যে কমবেশি কোন সঠিক মানসিক অবস্থা গ্রহণ করতে হবে (কোন পেশাদারী কারিগরি প্রক্রিয়া বোঝার প্রস্তুতি হিসেবে) বা এমন কোন আবেগের জানালা খুলতে হবে যেটা অনেক কবি কবিতা রচনার প্রাক্কালে অনুভব করে থাকেন। এজন্যই এই বিবৃতি এমন ভাষায় দেয়া হয়েছে যেন অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে ধারণা দেয়া নয় বরং সেই "অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গির" উপস্থিতির ব্যাপারে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় *বক্তব্য তুলে ধরা যায়।*

এখন মনোযোগ দিয়ে আমি যা ব্যাখ্যা করছি তা শুনুন। মনের অভ্যন্তরীণ কিছু পথের মধ্য দিয়ে বিশেষ আলোকিত শক্তির মুখোমুখি হবার প্রয়াসে এই যাত্রা এবং তাই মনের মাঝে দিকনির্দেশনাগুলো ভালও করে গেঁথে নিন। অন্তরের এই পথ অনুসন্ধান হতে পারে আলোকিত অথবা তমসাচ্ছন্ন। দুটো পথই আপনার সামনে উম্মোচিত হবে সুতরাং সতর্ক থাকুন।

যদি মনের অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চলে নিজেকে পতিত হতে দেন তবে শরীরের জয় হবে এবং দৈহিক প্রবৃত্তির হাতে থাকবে নিয়ন্ত্রণ। প্রেতাত্মা, বল আর স্মৃতির ফোয়ারা বিস্ফোরিত হবে। এখান থেকে কেবল নীচে, আরও নীচে অবনতি হতে থাকবে। সেখানে অনুভূত হবে ঘৃণা, প্রতিশোধ, অবাকবোধ, মালিকানার চিন্তা, ঈর্ষা, অভিলাষ আর চিরস্থায়ী হবার বাসনা। আরও যদি নীচে নামা হয় তখন সেখানে হতাশা, অভিযোগ আর সেসকল ইচ্ছা অভিপ্রায় আপনাকে গ্রাস করবে যেটা কেবলই মানবজাতির স্খলন এবং ধ্বংসের প্ররোচনা দিয়ে চলেছে।

যদি আলোকিত পথের দিকে নিজের মনকে চালিত করেন তবে প্রতি পদে বাধাবিপত্তি আর ক্লান্তির মুখোমুখি হবেন। উপরে ওঠার সিঁড়ি বেয়ে চলার ক্লান্তিই এর মূল কারণ। নিজের জীবন, নিজের অগণিত স্মৃতি, নিজের অতীতের সকল কৃতকর্ম সবকিছুরই ভার অনুভব

করতে থাকবেন এবং উপরের দিকে এই আরোহণ যাত্রা কঠিন মনে হতে থাকবে কারণ শরীর সর্বদাই চায় সব নিয়ন্ত্রণ করতে তাই সে সহজেই এসময় ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

এই আরোহণের অভিজ্ঞতা অর্জনের সময় পথিমধ্যে নিখাদ কিছু বর্ণ আর অশ্রুতপূর্ব কিছু ধ্বনি শুনতে পাবেন।

নির্ভেজালতার অগ্নি মুখোশ আর ভৌতিক চরিত্রদের উপস্থিতি দেখে পালিয়ে যাবেন না।

ভয় এবং নিরুৎসাহিত বোধ করাকে তিরস্কার করে তাড়িয়ে দিন।

নিম্নস্থলের অন্ধকার কোথাও পালিয়ে বাঁচার ইচ্ছাকে দমন করুন।

স্মৃতির পিছুটান থেকে দূরে সরে আসুন।

যাত্রাপথের চাকচিক্য আর আকর্ষণ উপেক্ষা করে অবিচল মনোযোগ সহ উম্মুক্ত অন্তরে আরোহণের সিঁড়িতে পা ফেলতে থাকুন।

বিশুদ্ধ আলোর রশ্মিতে পর্বতমণ্ডলীর উচ্চ শিখরগুলো উদ্ভাসিত হতে থাকবে, অজানা সুরের মূর্ছনায় মায়াময় মালভূমি আর শস্যক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে ঐ নীচে শত বর্ণের স্বচ্ছ জলরাশি দৃষ্টিগোচর হবে।

আলোর প্রবল প্রভাবে ভীত হবেন না কারণ এটা বারবার দ্বিগুণ শক্তিতে আপনাকে আপনার সত্ত্বার ভারসাম্য কেন্দ্র হতে দূরে ছিটকে ফেলতে চাইবে। বরং এটাকে জল আর বায়ুর মত করে আলিঙ্গন করুন, কারণ এর মাঝেই নিহিত আছে আসল জীবন।

বিশাল সব পর্বতমালার কোল ঘেঁষে লুকিয়ে থাকা সেই গোপন শহরের যখন সন্ধান পাবেন তখন এর প্রবেশদ্বার কোথায় সেটা আপনাকে জানতে হবে। এটা আপনি তখনই জানতে পারবেন যখন সত্যিকার অর্থে আপনার আপনার জীবনের রূপান্তর সম্পন্ন হয়েছে। এই গোপন গন্তব্যের চারিদিকে আছে আকাশচুম্বী প্রাচীর যার দেয়াল জুড়ে রয়েছে দিকনির্দেশনা, রয়েছে চিত্রকর্ম, রঙবেরঙ

বর্ণিল আঁকিবুঁকি আর রয়েছে অনুভূতি আর অর্থ। এই শহরে অবস্থান করছে কি কি ঘটে গিয়েছে সেগুলো এবং কি করণীয় সেটা। কিন্তু আপনার অন্তরনয়নে যেটা সচরাচর অদৃশ্য সেটা আজ সহজেই দৃশ্যমান। হ্যাঁ, এই প্রাচীরগুলো আসলেই অভেদ্য!

লুকায়িত এই গোপন শহরের সকল শক্তিকে আপন করে নিন। আলোকিত মুখাবয়ব আর হস্ত যুগল নিয়ে ফিরে যান সেই ঘনবসতিপূর্ণ যান্ত্রিক জীবনে।

XV. শান্তির অভিজ্ঞতা এবং শক্তির যাত্রা গাঁথা

1. পুরোপুরিভাবে শরীরকে শিথিল করুন এবং মনকে করুন শান্ত। কল্পনা করুন যে এক স্বচ্ছ আর দ্যুতিময় আলোক গোলক ধীরে ধীরে আপনার ওপর অবতীর্ণ হচ্ছে এবং পরিশেষে আপনার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রতিষ্ঠিত হল। আপনি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যখন মস্তিষ্কের মাঝের এই আলোর গোলকের প্রতিচ্ছবি নিজের বুকের মাঝে অনুভূত হবে।

2. গভীরভাবে অনুভব করুন এই আলোকের গোলক কেমনভাবে ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে আপনার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে শরীরের বাইরে ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। একই সময়ে আপনার শ্বাসপ্রশ্বাস হতে থাকবে আরও দীর্ঘ, আরও গভীর। শরীরের সহন এবং বোধশক্তির সীমান্তে পৌঁছে গেলে সকল দৈহিক এবং মানসিক ক্রিয়াকলাপ স্থগিত করুন। ঠিক এই সময়েই অনুভব করতে পারবেন অন্তরের শান্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত পর্যাপ্ত মনে হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই অনুভূতির মেঘমালায় ভাসতে থাকুন।

   অতঃপর ধীরে ধীরে মন মস্তিষ্কের এই অন্তর্মুখী প্রসারণ গুটিয়ে আনুন। ঠিক শুরুর সময় যেমন হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে এই গোলকের উৎপত্তি হয়েছিল ধীরে ধীরে সেই স্থানে ফিরে গিয়ে শান্তিময় এবং আরামদায়ক এই অনুশীলনের অবসান ঘটান। এই প্রক্রিয়াটাকেই বলে "শান্তির অভিজ্ঞতা"।

3. কিন্তু পক্ষান্তরে যদি শক্তির অভিযাত্রার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চান তবে অনুভবের প্রসারণ কমিয়ে আনার বদলে যতক্ষণ নিজ আবেগ আর ধৈর্যশক্তি সমর্থন যোগায় ততক্ষণ পর্যন্ত সেই অনুভব বাড়াতে থাকুন। শ্বাসপ্রশ্বাসের ওপর মনোযোগ দেয়ার দরকার নেই, যতক্ষণ সেটা নিজে থেকেই

হতে থাকবে সেই সময়ে আপনি দেহের বাইরে সেই অনভুতির উপস্থিতি আঁচ করার চেষ্টা করুন।

4. আরেকটা জিনিস আবারও বলছিঃ এমতাবস্থায় আপনার অবিচল মনোযোগ থাকতে হবে ক্রমবর্ধমান সেই আলোর গোলকের ওপর। যদি কোন কারণে এই মনোযোগ দিতে না পারেন তবে অন্য কোন সময়ে আবার চেষ্টা করুন। অনুভূতির অভিযাত্রার অভিজ্ঞতা অর্জন না করতে পারলেও এক বিচিত্র শান্তি ঠিকই আপনার মনে বিরাজ করবে।

5. এর বদলে যদি আরও দূরে নিজেকে নিয়ে যান তবে সেই অভিযাত্রার অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। নিজের হাত আর শরীরের অন্যান্য স্থান হতে এক নতুন পুলক অনুভূত হতে থাকবে যেটা কিনা আগে কখনও হয়নি। অতঃপর ক্রমবর্ধমান কিছু তরঙ্গের দোলায় দোলার অনুভূতি হতে থাকবে এবং বহুমুখী বর্ণিল আর বিস্তারিত নানান ছবি আর আবেগের প্লাবনে আপনি প্লাবিত হবেন। সুতরাং সেই অভিযাত্রায় তখন শামিল হয়ে যান...

6. শক্তিলাভের পর নিজস্ব বহিঃপ্রকাশের স্বভাব অনুযায়ী বিচিত্র সব শব্দ অথবা আলোর ঝলক দেখতে পারবেন। এমতাবস্থায় সবচেয়ে জরুরী হল উঁচু লেভেলের সচেতনতা বজায় রাখা। এমন এক সচেতনতা যেটার কারণে আলোর দ্যুতি বাড়তেই থাকবে এবং পারিপার্শ্বিক সব ঘটনাবলীর মূল কারণ সহসাই বুঝতে পারবেন।

7. নিজ ইচ্ছামাফিক নিরবিচ্ছিন্ন এই মানসিক স্থিতি থেকে বেরিয়ে আসুন (যদি ইতিপূর্বে মনোযোগে ঘাটতি না হয়ে থাকে তো)। কল্পনা আর অনুভব করুন সেই আলোর গোলক ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে এবং আপনার শরীরের মধ্যে কেন্দ্রস্থলে আবারও ঢুকে যাচ্ছে ঠিক যেখান থেকে সেটার উৎপত্তি হয়েছিল।

8. জেনে অবাক হবেন যে সচেতনতার বিভিন্ন স্তরে পৌঁছানোর জন্য উপরে বর্ণীত নিয়মাবলীর মত বিভিন্ন প্রক্রিয়া বিদ্যমান আছে। বলা বাহুল্য যে এমন অনেক নিয়মকানুনই নানান সব রীতিনীতি, ক্লান্তি পরিশ্রম, পাগলামি আর প্রেতাত্মার ভর করা, পুনরাবৃত্তি আর বিভিন্ন রকমের অঙ্গভঙ্গির ছদ্মাবরণে আবৃত। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শ্বাসপ্রশ্বাস আর শরীরের অভ্যন্তরীণ অনুভূতির তারতম্য হতে থাকে। বলে রাখা বাঞ্ছনীয় যে সম্মোহন, মধ্যমত্ব আর মাদকের মাধমেও প্রায় একই ধরণের পরিবর্তিত অনুভূতি আর অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু এসব পথ অনুসরণ করলে অনুভূতির ওপর কোন নিয়ন্ত্রণই থাকবে না এবং কি ঘটছে বা ঘটেছিল যে ব্যাপারে সব স্মৃতিও লোপ পাবে। অনুভূতির এই জাতীয় বহিঃপ্রকাশ থেকে একশ হাত দূরে থাকুন এবং সহজ "ধ্যানের" মধ্য দিয়ে অন্তরের অভিযাত্রায় শামিল হোন কারণ আপনার আগে বহু অজ্ঞ নির্বোধ, অভিজ্ঞতা পিপাসু এমনকি "সাধুপুরুষরাও" এই পথ অবলম্বন করেছেন যেটার ব্যাপারে পুরাণেও উল্লেখ করা আছে।

9. যদি উপরে বর্ণীত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে থাকেন তবে শান্তির অভিযাত্রায় শরীক হবার কথা। তথাপি যদি সেটা অনুভব না করতে পারেন তবে এর কারণ মনোযোগের অভাব ছাড়াও অন্তরের কোন চিন্তা সংশয়ও হতে পারে। মনের ভেতর সেই আলোকিত সব চিত্রাবলী খণ্ডিত দেখাতে পারে এবং সবকিছু খাপছাড়া মনে হতে পারে। বিখন্ডিত আবেগের আলোড়নই এহেন অবস্থার জন্য দায়ী এবং এগুলো আপনার নিত্যনৈমিত্তিক জীবনেই প্রতিনিয়ত উপস্থিত থাকতে পারে।

XVI. শক্তির অভিক্ষেপণ

1. যদি শক্তির অভিযাত্রার অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকেন তবে সহজেই বুঝতে পারবেন যে এই একই ধরণের অনুভূতির ওপর ভিত্তি করে অনেকটা না বুঝেই কিভাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্নরকম রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং কিভাবে এসকল প্রথা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। উপরে বর্ণীত প্রক্রিয়া অনুসরণ যারা করেছে তারা তাদের শরীরে এক ধরণের দ্বিগুণ শক্তির উপস্থিতি অনুভব করতে পেরেছে। শক্তির অভিজ্ঞতা তাদের শরীরে এমন অভূতপূর্ব এক অনুভূতি সৃষ্টি করেছে যাতে করে তাদের মনে হয়েছে যেন ঐ শক্তি নিজে থেকেই শরীরের বাইরে নিজেকে প্রক্ষেপণ করছে।

2. সহজেই গ্রহণ করতে পারে এমন অন্যান্য ব্যক্তি আর বস্তুর ওপর এই শক্তি প্রক্ষেপিত হয়েছিল। আমার বিশ্বাস এটা আপনার বুঝতে সমস্যা হবার কথা না যে ধর্মীয় বিভিন্ন বাণী, পবিত্র স্থান আর সাধুসন্তদের কিভাবে এই বিশেষ শক্তি বর্তানো হয়েছিল। কোন উপাসনালয়ে যখন বস্তুবিশেষকে ঘিরে ধর্মীয় রীতিনীতির আলোয় ভক্তি সহকারে প্রার্থনা করা হয় তখন উপস্থিত উপাসনাকারীদের পুনঃপুন সম্মিলিত উপাসনার শক্তি ঐ বস্তুবিশেষে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। এটি মানব জ্ঞানের একটি সীমাবদ্ধতা এবং এটা বরাবরই সংস্কৃতি, মহাশূন্য, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সূত্র ধরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অথচ মৌলিক অভ্যন্তরীণ একটি উপলব্ধি এসব কিছু বুঝতে পারার একটা অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

3. শক্তির এই প্রক্ষেপণ, প্রয়োগ আর পুনর্বহাল করার ব্যাপারে আমরা পরে আবারও আলোচনা করব। আপাতত এতটুকু ঠিকই বলব যে অনেক সমাজ আছে যেটা কিনা ধর্মের প্রলেপ থেকে মুক্ত কিন্তু অনেক নেতা-নেত্রী আর হোমরাচোমরা ব্যক্তিবর্গ এক বিশেষ ধরণের প্রভা নিজেদের চারিপাশে বিকিরণ করেন। তাদের দেখে অনেকেই ছুঁয়ে দেখতে চায়,

তাদের কাপড় বা ব্যবহৃত কোন কিছু হাতে পেলে নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান ও সক্ষম মনে করে।

4. উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত সবকিছুকে আমরা চোখ উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি। যারা জ্ঞানী, ভাল মানুষ এবং বলবান, তাদের আমরা উঁচু নজরে দেখি। কিন্তু এই উঁচু মহলে আরও রয়েছে সমাজের সব শ্রেণীবিন্যাস, ক্ষমতার দাপট, প্রতিপত্তির পতাকা আর রাষ্ট্র। আর আমরা নশ্বর মানবজাতি, আমরা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে থাকি এই উঁচু মহলে অবস্থিত সবকিছুকে কাছে পাবার জন্য। আমরা আসলে কতটা খারাপ, আমাদের অভ্যন্তরীণ বহিঃপ্রকাশের সাথে মেলে না তা সত্ত্বেও মাথা সেই উঁচুমহলে ডুবিয়ে পা মাটিতে রেখে আমরা এই মরীচিকার পেছনে ছুটতে থাকি। কতটাই তুচ্ছ আমরা যে এসব জিনিসে বিশ্বাস করি (বিশ্বাস করি কারণ অভ্যন্তরীণ বহিঃপ্রকাশেই নিহিত আসল বাস্তবতা)। কতটাই খারাপ আমরা, অন্তরের গহীন চাহনি উপেক্ষা করে বহির্জগতেই দৃষ্টিপাত করে বেড়াচ্ছি।

XVII. শক্তি হানি এবং শক্তির অবদমন

1. অধিক হারে শক্তির বহিঃপ্রকাশ তখনই হয় যখন কোন কর্মের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। যেমনঃ লাগামহীন কল্পনাশক্তি, নিয়ন্ত্রণহীন কৌতূহলতা, অন্তহীন কথোপকথন, মাত্রাতিরিক্ত যৌনক্ষুধা এবং অতিরঞ্জিত দৃষ্টিভঙ্গি (উদ্দেশ্যহীন ভাবে কিছুর দিকে তাকানো, কিছু শোনা, কিছু বা কাউকে পছন্দ করা ইত্যাদি)। তথাপি মনে রাখতে হবে অনেকেই আছেন এভাবে নিজেকে ভারমুক্ত করেন কারণ অন্য কোনভাবে তা করাটা কিছুতা বেদনাদায়ক বৈকি। এধরণের ক্রিয়াকলাপের মূল কারণ বিশ্লেষণ করে আমি দেখেছি যে এজাতীয় প্রবৃত্তি নির্মূল না করে বরং নিয়ন্ত্রণ করাটাই সমীচীন।

2. যৌনতার বিষয়টি কিন্তু যত্নসহ বিবেচনা করতে হবেঃ এই প্রবৃত্তিকে দমন করা বা চাপিয়ে রাখা উচিত নয় কারণ এতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হতে পারে। যৌনতা নিজে থেকেই উৎপন্ন এবং নিজেতেই তার উপসংহার। তথাপি খেয়াল রাখতে হবে যেন মাত্রাতিরিক্ত কাম-কল্পনা আর নিত্যনতুন বস্তু লুফে নেবার বাসনা যেন সীমা অতিক্রম না করে।

3. নৈতিকতার আবরণে যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার সামাজিক এবং ধর্মীয় প্রয়াসের সাথে বিবর্তনের কোন সম্পর্কই নেই বরং এর বিপরীতটাই ঠিক।

4. শোষিত নিপীড়িত সমাজের গোধূলিলগ্নে শক্তির (মহাসত্ত্বার বলের) বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল। সেখান থেকে তাবৎ অসুরের জন্ম হয়েছিল যেমন ভূত প্রেত, ডাইনি, আর নানা মাত্রার অপরাধী যারা কিনা জীবনের সৌন্দর্যের অপচয় আর অবক্ষয় থেকে নিছকই নিজেদের মনোরঞ্জন করছিল। অনেক উপজাতি আর সভ্যতায় এমন অনেক অপরাধী ছিল যাদের অনেককেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। অন্যদিকে যা কিছু ছিল বিজ্ঞান আর প্রগতির পক্ষে, তার বিরুদ্ধে বিরোধিতা ছিল

ব্যাপক কারণ এসবই ছিল অযৌক্তিকতা, গোঁড়ামি আর শোষণের বিরুদ্ধে সক্রিয়।

5. অনেক প্রাচীন সভ্যতায় যৌনতাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে এই ভেবে যে এটা অগ্রসর সভ্যতার চিহ্ন। উভয় ক্ষেত্রে এটা প্রতীয়মান হয় যে লক্ষণগুলো ধ্বংসাত্মক কিন্তু এহেন পরিস্থিতির উদ্রেক হবার কারণগুলো ভিন্ন।

6. যদি আমাকে যৌনতার ব্যাপারে আরও প্রশ্ন করেন তবে বলব যে এটা আসলেই পবিত্র এবং এই সেই কেন্দ্রস্থল যেখান হতে জীবন এবং সৃষ্টির সূচনা। তথাপি এটাও ঠিক যে এর কার্যপ্রণালী যদি আওতার মধ্যে না থাকে তবে এই যৌনতাই হতে পারে সকল ধ্বংসের অন্যতম মূল কারণ।

7. বিষবাষ্প ছড়ায় এমন মিথ্যুকদের কথায় কখনও বিশ্বাস করবেন না যে যৌনতা নিষিদ্ধ বা লজ্জার কোন জিনিস। পক্ষান্তরে যৌনতা আসলেই সুন্দর একটি অভিব্যক্তি এবং এর মাধ্যমে পারস্পরিক ভালবাসার কত নবতরঙ্গ যে অনুভূত হয় তা অস্বীকার করা যায় না।

8. সুতরাং এটাকে একটি পরম বিস্ময়কর ব্যাপার হিসেবেই বিবেচনা করুন এবং যত্নের সাথে উপভোগ করুন। লক্ষ্য রাখুন যেন এটা কোন অভ্যন্তরীণ দ্বিধাদ্বন্দ্বের সূত্রপাত না করে বা প্রয়োজনীয় প্রাণ শক্তিতে যেন বিভেদ বিভাজনের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

XVIII. শক্তির ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া

আমি আগেও আপনাদের বলেছি "যে যখনই বিশাল কোন শক্তি, সুখ আর ভাল লাগার অনুভূতির উদ্রেক হবে বা যখন নিজেকে মনে হবে মুক্ত এবং সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে দূরে তখনই নিজ সত্বার প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করুন।"

1. "ধন্যবাদজ্ঞাপন" করার অর্থ মনমেজাজ চাঙ্গা করে এমন কোন ছবি বা অভিজ্ঞতার কথা নিজের মনের পর্দায় প্রতিফলিত করা। এভাবে বারবার ভাল লাগার কোন ছবি বা অভিজ্ঞতা ভাল সময়ে নিজের মনে গেঁথে নিতে থাকলে পরবর্তীতে পারিপার্শ্বিকতার কারণে যখন দুঃসময়ের ঘনঘটা ছায়া ফেলবে তখন ঐ ভাল লাগার ছবি আর অভিজ্ঞতার কথা ভেবে সেই দুর্বিষহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

2. এসব কিছুর জন্য অতীতের সব ভাল সময়ের অনুভূতিগুলো সঞ্চয় করে রাখতে হবে যেন দরকার হলে অধিকমাত্রায় তা প্রয়োগ করা যায়। আর এটা পুনরাবৃত্তি করার দরকার নেই যে এই প্রক্রিয়া (অবোধ্য হলেও) বাইরের ব্যক্তি বা বস্তু অথবা নিজের অন্তরের কোন কিছুর ওপর প্রতিফলিত হয়। সেটা এই জন্য হয় যে অনুরোধ আর আশা প্রত্যাশার চাহিদা পূরণের সময় হাত নাড়ালে যেন সাড়া মেলে।

XIX. অন্তরের বিভিন্ন স্তর

ধরে নিচ্ছি এতদূর এসে অন্তরের বিভিন্ন স্তর, সারা জীবন জুড়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অনুভূতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি আর সামগ্রিক বিবর্তনে নিজের কি ভূমিকা সে ব্যাপারে পর্যাপ্তভাবে ভাবার সময় পেয়েছেন। ছবি (এক্ষেত্রে রূপক) ব্যবহার করা ছাড়া এবিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়ার কোন উপায় আমার কাছে নেই। এগুলো আমার মনে হয় জটিল অনুভূতিগুলোকে কেন্দ্রীভূত করে চিত্রায়িত করার একটা প্রক্রিয়ামাত্র।

যারা এই জিনিসগুলোকে নিয়ে চিন্তিত তারা আমাদেরকে সবসময় এমন বিচ্ছিন্ন *ভাবে এই অনুভূতির স্তরগুলোর সাথে পরিচয় ও অভ্যস্ত করিয়ে দিয়েছেন যাতে করে আমাদের মনে হয় এই স্তরগুলো একই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন মুহূর্তমাত্র।*

1. প্রথম স্তরটা হল যেখানে অর্থহীনতা বিরাজ করে (প্রথমেই যেটার ব্যাপারে উল্লেখ করেছিলাম) এবং এই স্তরকে আমরা বলব "বিকীর্ণ জীবনীশক্তি"। এখানে সবকিছুই শারীরিক চাহিদা দ্বারা চালিত হয় এবং প্রায়ই তা আমাদের বিপরীতধর্মী প্রত্যাশা আর প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে বিভ্রান্ত করে। অনুপ্রেরণা এবং কর্তব্যের ওপর অন্ধকার ছায়া বিরাজ করে সেখানে। এই অবস্থায় মানুষ বিভিন্ন পরিবর্তনশীল অনুভূতির মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করতে থাকে। এখান হতে সামনে কেবল দুটি পথই খোলাঃ একটি মৃত্যুর আরেকটি পরিবর্তনের।

2. মৃত্যুর অভিযাত্রা আপনাকে কেবলই কণ্টকময় অন্ধকার এক পথে চালিত করে। আদিম যুগের জনগোষ্ঠীরা এই পথের ব্যাপারে অবগত ছিল এবং তারা এর নাম দিয়েছিল পাতাল পৃথিবী বা অতল গহ্বর। উপরন্তু অনেকেই ছিলেন যারা পরবর্তী আলোর জগতে প্রবেশ করার অভিপ্রায়ে আগে এই অন্ধকার জগতে তলিয়ে গেছেন। এটা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান যে

মৃত্যুর নীচে এই স্তরেই আছে বিকীর্ণ জীবনীশক্তি। হয়তবা মানুষের মস্তিষ্ক মৃত্যু পরবর্তী নশ্বর শরীরের তাবৎ বিভাজন আর বিলীন হয়ে যাওয়াকে বিশেষ কোন রূপান্তরমাত্র হিসেবে গণ্য করে, হয়তবা জন্ম পূর্ববর্তী কোন অবস্থার সাথেও সেটা তুলনীয়। যদি আপনার নির্দেশনা হয়ে থাকে আরোহণ করার তবে মৃত্যু আপনার অভ্যন্তরীণ স্তরের সাথে একটি বিচ্যুতি ঘটায়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ব্যক্তি অন্য একটি স্তরে আরোহণ করে।

3. এই স্তরে পৌঁছানো পূর্ববর্তী অনুভূতিতে ফিরে যাবার আশ্রয় দান করে। এখান হতে দুটি পথ খোলা থাকেঃ একটি হল অনুতাপের আর আরেকটি হল আরোহণের অর্থাৎ মৃত্যু পথযাত্রা। যদি প্রথম পথ অবলম্বন করেন তবে এর কারণ হল আপনি আপনার অতীতের সাথে সম্পর্ক ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর যদি মৃত্যুর পথ বেছে নেন তবে আবারও যেই তমসাচ্ছন্ন অন্ধকারে পুনরায় পতিত হয়ে বন্ধ এক চক্রে ঘুরপাক খেতে থাকবেন।

4. এখন আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে এই ভয়াবহ নশ্বরতা থেকে বাঁচার আরও একটি উপায় আছে এবং সেটা হল রূপান্তর। যদি আপনি এই পথ অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেন তবে এটা নিশ্চিত যে আপনি আপনার করুণ জীবদ্দশা থেকে পরিত্রাণ চান কিন্তু তাও ঐ জীবনের কিছু সুযোগসুবিধা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চান না। এটা আসলে নকল একটি পথ যেটাকে অনেকে মোচড়ানো হাত হিসেবেও উল্লেখ করে থাকে। অনেক দৈত্য রাক্ষস এই নিপীড়নময় পথের গহীন কণ্টক থেকে বেরিয়ে এসেছে। তারা চেয়েছিল আকাশ জয় করতে কিন্তু নরককে ত্যাগ করে নয়। এই কারণে তারা অর্ধেক বিশ্বব্যাপী দ্বন্দ্বপূর্ণ নানান বৈপরীত্যের সূত্রপাত করিয়েছে।

5. ধরে নিচ্ছি নিজের সচেতন অনুতাপের জোরে মৃত্যুর ধ্বংসস্তূপ থেকে আপনি প্রবৃত্তির মূল উৎস ফোয়ারার সামনে উপস্থিত

হয়েছেন। দুটি কার্নিশ এই উৎস ধরে রেখেছে। একটা হল সংরক্ষণ আর আরেকটা হল হতাশা। চিরজীবী হওয়ার অভিলাষ মিছে এবং অনিশ্চয়তায় পূর্ণ। এই পথ ধরে চলতে থাকলে চিরজীবী হয়ে থাকার মিথ্যা আশ্বাস লাভ করবেন কিন্তু বাস্তবে অতি দ্রুত অবনতির দিকে ধাবিত হবেন। যদি হতাশার কণ্টকময় পথ বেছে নেন তবে যাত্রা হবে কষ্টদায়ক কিন্তু অনবদ্য এবং নিখাদ।

6. এক ব্যর্থতা থেকে আরেকটায় হোঁচট খেতে খেতে হাজির হবেন পরবর্তী বিশ্রামস্থলে যেটার নাম "প্রত্যাবর্তনের নীড়"। সামনের দুটি পথের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। হয় আপনি উদ্দেশ্যমণ্ডিত পথ অনুসরণ করতে পারেন যেটা আপনাকে নিয়ে যাবে সমৃদ্ধির দিকে। অথবা বেছে নিতে পারেন ফিরে যাবার পথ যেটা কিনা নতুন করে আপনাকে পূর্ববর্তী পেছনে ফেরার স্তরে ছিটকে ফেলবে। এখানেই উপস্থিত হবে আপনার সামনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব। সচেতন বিবেকের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে হয় বেছে নিবেন সজাগ জীবনের গোলকধাঁধা (এবং দৃঢ় নিষ্ঠার সাথে তা পালন করবেন) অথবা অতীতের গ্লানিময় জীবনের অন্ধ কুয়ায় আবারও ঝাঁপ দিতে উদ্যত হবেন। এমন অনেকেই আছেন যারা নিজেদের অগ্রসর হবার সম্ভাবনাকে নিজে হাতেই কর্তন করে ফেলেছেন।

7. কিন্তু যারা অবিচল নিষ্ঠার কারণে উচ্চস্তরে আরোহণ করেছেন তাদের সামনে রয়েছে পরম প্রশান্তির এক নীড় যেটার নাম প্রবৃদ্ধি। সামনে থাকবে তিনটা দরজাঃ একটার নাম পতন, আরেকটার নাম ইচ্ছাশক্তি এবং তৃতীয়টার নাম অবক্ষয়। পতনের দুয়ার নিয়ে যাবে গহীন অন্ধকারের দিকে এবং বাইরের কোন দুর্ঘটনাই একমাত্র আপনাকে এর দিকে ধাক্কা দিতে পারে। এই দরজাটা বেছে নেয়া আসলে কঠিন। অন্যদিকে অবক্ষয়ের পথ আপনাকে পরোক্ষভাবে নিয়ে যাবে কষ্টের কালিমালিপ্ত এক অলস কুয়ায় যেখানে সর্পিল এক ঘূর্ণিপাকে হারিয়ে যেতে যেতে মনে পড়বে জীবনে যা কিছু হারিয়েছেন বা উৎসর্গিত করেছিলেন সেগুলোর কথা। বিবেকের যে

টানাপড়েনের পরীক্ষার ভেতর দিয়ে মানুষ অবক্ষয়ের পথে চালিত হয় সেটা কিন্তু আসলে একটা মিথ্যে পরীক্ষা কারণ এই যাত্রায় অনেক কিছুর অনুমান ভুল হয় এবং অসম জিনিসের মধ্যে মানুষ তুলনা খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা করে। আরোহণ করার যে চেষ্টায় লিপ্ত আছেন সেই শক্তিকে অপচয় করে মন আপনাকে তথাকথিত যেসকল ভোগ লালসা পরিত্যাগ করেছেন সেগুলো নিয়ে ভাবিয়ে তুলতে চায়। কাছে থেকে জিনিসগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখবেন যে আপনি কিন্তু আসলে কিছুই পরিত্যাগ করেননি, যদি কিছু করেও থাকেন তাহলে তা কেবলই অন্যের জন্য। উচ্চ স্তরে আরোহণের অভিপ্রায়কে বিকৃত করে দেয়াই অবক্ষয়ের এই পথের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু আরোহণের সময় এই কারণটি প্রতীয়মান হয়নি। অনুপ্রেরণাকে ভুল আলোয় দেখানোর কুচক্রী ইচ্ছায় অবক্ষয়ের শুরু। আমি এখন প্রশ্ন করিঃ আমাদের চোখে ধুলো দেয় কি সেটা? এটা কি প্রারম্ভের উৎসাহ উত্তেজনা? নাকি কিছু শুরু করার আলস্য? নাকি এটা এমন কোন আত্মত্যাগের মিথ্যে স্মৃতি যেটা আসলে অস্তিত্বহীন? নাকি অন্য কোন কারণ আছে এই অনুপ্রেরণার? আমি আপনাকে বলছি এবং প্রশ্ন করছিঃ অনেক দিন পূর্বে আপনার আবাসস্থল আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। একারণে আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে উচ্চ স্তরে আরোহণ করার প্রয়াস করবেন। নাকি এটা ভাবছেন যে যেহেতু আরোহণ করতে চেয়েছিলেন সেকারণে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছিল? একটু কি দৃষ্টি মেলে দেখেছিলেন আশেপাশের বাড়ীগুলোর কি অবস্থা? কোন সন্দেহ নেই যা আপনাকে মধ্যম দুয়ারের কড়া নাড়তে হবে।

8. অভিপ্রায়ের ছোট্ট সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলুন এবং হাজির হোন নড়বড়ে এক গম্বুজে। এখান থেকে সরু আর সর্পিল আঁকাবাঁকা গলি ধরে এগোতে থাকুন এবং এই গলির নাম হল চাঞ্চল্য চপলতা। অতঃপর এমন এক প্রশস্ত বিশাল উম্মুক্ত স্থানে আপনার আগমন হবে যেটার নাম হল শক্তির উম্মুক্ত স্থল।

9. এই মরুময় উন্মুক্ত স্থানের বিশালতা আর সেই রাতের চারিপাশের পিনপতন নীরবতা আর অবিচল নক্ষত্রমণ্ডলীর উপস্থিতিতে আপনি ভীতবোধ করতে পারেন। সেখানে ঠিক নিজের মাথার উপরে এক কৃষ্ণচন্দ্রিমার আকৃতি বুঝতে পারবেন, এমনই এক বিচিত্র চন্দ্রগ্রহণের কালো চাঁদ যেটা কিনা সূর্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে ধৈর্য সহকারে আপনাকে ভোরের আলো ফোঁটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে কারণ শান্ত থাকলে আপনার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

10. এমন অবস্থায় মনে হতে পারে ঐ স্থান থেকে অনতিবিলম্বে পালিয়ে যাওয়া উচিত। যদি এমনটা হয় তবে আগামীকালের অপেক্ষা না করেই যেকোনো স্থানে ছুটে যাবার জন্য মন ব্যাকুল হতে পারে। মনে রাখতে হবে যে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানো সকল গতিবিধি মিথ্যে এবং সাধারণত তড়িৎ সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে হয়ে থাকে। আমি যা এখানে বললাম তা ভুলে গিয়ে থাকলে নিশ্চিতভাবে এক অতল ঘূর্ণির কবলে পড়ে ধ্বংসের এক নিকষ কালো অন্ধকার জগতে হারিয়ে যাবার ভয় থাকবে।

11. অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন স্তরগুলো যে একটা আরেকটার সাথে জড়িত এটা বোঝা কতটা কঠিন! বিবেক যে যুক্তিতর্ক মানতে চায় না সেটা যদি দেখতে পান তবে লক্ষ্য করবেন যে এমন পরিস্থিতিতে যারা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের তাড়নায় ঝাঁপ দেয় তারা ক্রমশই অবক্ষয়ের দিকে নুয়ে পড়তে থাকে। কোন এক দিন উপলব্ধি করা যাবতীয় আলোকমণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি ভুলে গিয়ে তারা পর্যায়ক্রমে হতাশা, অনুতাপ আর মৃত্যুর অগ্নিকূপে পতিত হয়ে নিঃশেষিত হয়ে যায়।

12. যদি উন্মুক্ত প্রান্তরে খোলা আকাশের নীচে আরোহণ করতে পারেন তবে আসল বাস্তবতাকে পরের দিনের সূর্যের আলোয় স্নাত হতে দেখবেন। তখন অনুধাবন করতে পারবেন যে অস্তিত্ব আছে এমন সবকিছুরই একটি পরিকল্পনা বিদ্যমান।

13. এই পর্যায় থেকে অধঃপতন হওয়া মুশকিল, যদি না আপনি নিজ ইচ্ছায় অন্ধকার জগতে পতিত হয়ে আলোকরশ্মি ছড়ানোর ইচ্ছাপোষণ করেন।

এসব বিষয়গুলো নিয়ে কথা বাড়িয়ে আর লাভ নেই কারণ অনভিজ্ঞ হলে প্রতারিত হবেন, বাস্তবতার জয়যাত্রা অলীক কল্পনায় আচ্ছাদিত হবে। এ পর্যন্ত যা বললাম সেটা হতে দিন। আমার বক্তব্য উপকারী না মনে হলে আপত্তি জানাতে পারেন, কারণ কোনকিছুরই মৌলিক ভিত্তি আর নেতিবাচকতার কোন কারণ নেই। আয়নার একটি ছবির সন্নিকটে, শব্দের কোন প্রতিধ্বনি, ছায়ার কোন প্রতিবিম্ব।

XX. অন্তরের বাস্তবতা

1. আমার বিবেচ্য বিষয়গুলোর ওপর মনোযোগ দিন। এতে বহির্জগতের নানান দৃশ্য আর রূপক ঘটনাবলীর বর্ণনা দেখতে পাবেন। এছাড়াও মানসিক জগতের নানা বাস্তবতার আসল রূপও এখানে দেখবেন।

2. এটাও বিশ্বাস করার দরকার নেই যে পথ চলতে গিয়ে যেসকল স্থানের মধ্যে দিয়ে গমন করবেন তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্বাধীন একটি অস্তিত্ব আছে। এরকম বিভ্রান্তির কারণে গভীর জ্ঞানও প্রায়ই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। এমনকি এখন পর্যন্ত অনেকে স্বর্গ, নরক, ভূত প্রেত, দেবদূত, দানব, রাক্ষস, যাদুর প্রাসাদ, দূরবর্তী মায়ার কোন শহর ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে এবং ধরে নেয় যে কেবল আলোকিত ব্যক্তিরাই এদের দেখতে পায়। এই একই কুসংস্কারের বিপরীতধর্মী আরেক বিশ্লেষণের কারণে স্বল্পজ্ঞানী সংশয়বাদীদের পাল্লা ভারি হয়ে গিয়েছে কারণ তারা ভাবছে যে এই ঘটনাগুলো নিতান্ত ভ্রম বা জ্বরাক্রান্ত মস্তিষ্কের উর্বর কল্পনাপ্রসূত বিলাপ ছাড়া কিছুই নয়।

3. আবারও বলছি, এসব কিছুর মধ্যে থেকে যেটা বুঝতে হবে যে এগুলো কিন্তু প্রকৃত মানসিক অবস্থা, বহির্জগতের অনেক কিছুকে রূপক বা প্রতীকী হিসেবে এই অবস্থাগুলোর বিবরণ দেয়া হয়েছে এই যা।

4. যা বলা হয়েছে তা গভীরভাবে অনুধাবন করার এবং রূপকের পেছনে যে সত্য জ্ঞান লুকিয়ে আছে সেটাকে আবিষ্কারের চেষ্টা করুন। এই রূপকগুলো যদিও অনেক সময় মনকে বিভ্রান্ত করতে পারে তথাপি কিছু কিছু বাস্তবতা আছে যেটা রূপক ব্যতিরেকে ব্যাখ্যা করাও মুশকিল।

যখন দেবতাদের সেই স্বপ্নের শহরের কথা বলা হয় যেখানে আরোহণের জন্য সকল জনগোষ্ঠীর বীর বিক্রমরা থাকে সচেষ্ট, যখন সেই অসীম সুখের স্বর্গপুরীর কথা বলা হয় যেখানে দেবতারা এবং পুণ্যবান পুরুষেরা একই সাথে দিনযাপন করে, যখন বলা হয় সেই বিশাল জলপ্রপাত আর জলরাশি প্লাবনের কথা, এসবই আসলে অন্তরের আসল সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

পরবর্তীতে তাবৎ পরিত্রাতার আবির্ভাব হয়েছে এবং তারা তাদের দ্বৈত রূপ এবং তাদের বাণী নিয়ে আমাদের মাঝে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল হারিয়ে যাওয়া সেই মধুমাখা এককতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। আবারও, সেটা অন্তরের সেই আসল সত্য ছাড়া কিছুই নয়।

তথাপি যখনই এসব জিনিস মন মস্তিষ্কের বাইরের কিছু হিসেবে দেখানো হয়েছে তখনই তাতে হয়েছে ভুল বা নিছক মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, অন্তরের চাহনিতে বিভ্রান্ত বহির্জগত বাধ্য করে নতুন নতুন পথ পন্থা অবলম্বন করে নিতে।

এভাবেই আজকের এই দিনে এই যুগের এই বীরবিক্রম উড়ে চলে গেল তারার দেশে পূর্ব থেকে অবহেলিত *সব অঞ্চলের উপর দিয়ে।*

নিজের পৃথিবীর বাইরেই সে উড়ে চলতে লাগলো এবং নিজের অজান্তেই নিজের অন্তরের সেই আলোকিত কেন্দ্রবিন্দুর দিকে পৌঁছে যেতে লাগলো।

নোট

অন্তরের চাহনি (La Mirada Interna) বিশটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি অধ্যায় ভাগ ভাগ করে দেয়া আছে। মূল অনুপ্রেরণাগুলোকে এভাবে নিজেদের মত করে সাজিয়ে নেয়া যেতে পারেঃ প্রথম দুটি অধ্যায় প্রারম্ভিক এবং এই বিবৃতির মূল উদ্দেশ্যের সাথে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেয়া, কি ধরণের ইচ্ছা অভিব্যক্তি পাঠকের কাছ থেকে কাম্য এবং কিভাবে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিবৃতির মূল বিষয়বস্তুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে সেটাই এই অধ্যায়গুলোর মূল উদ্দেশ্য।

A. দশ দিনের এক আত্মপ্রতিফলনের আলোকে সাধারণ কিছু বিষয় নিয়ে অধ্যায় III থেকে অধ্যায় XIII সাজানো হয়েছে।

B. অধ্যায় XIII তে একটি প্রাসঙ্গিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। সাধারণ আলোচনা শেষে কি কি করণীয় এবং কি ধরণের মনোভাব পোষণ করতে হবে সে ব্যাপারে এই অধ্যায়ে আলোকপাত করে হয়েছে।

C. পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে কি ধরণের অনুশীলনী সম্পন্ন করতে হবে সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। যে ক্রম অনুযায়ী বিষয়গুলো উপস্থাপন করে হয়েছে তা হলঃ

I. মেডিটেশন – বইয়ের মূল উদ্দেশ্যঃ অর্থহীনতা থেকে অর্থ পরিপূর্ণতায় রূপান্তর

II. বুঝতে চাইবার সাগ্রহ ইচ্ছা - বিষয়বস্তু বুঝতে চাওয়ার পূর্বশর্ত যে ধরণেরমানসিক স্থিতি

III. অর্থহীনতা – জীবন এবং মৃত্যুর অর্থ

IV. নির্ভরতা – মানুষের ওপর মাধ্যমের প্রভাব এবং কার্যকারিতা

V. অনুভূতিকে সন্দেহ করা – অনিয়মিত আশ্চর্যজনক কিছু মানসিক ঘটনা

VI. স্বপ্ন এবং জেগে ওঠা – সজাগতার বিভিন্ন স্তর এবং বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি (স্বপ্ন, আধো ঘুম আধো জাগ্রত, স্বপ্ন দেখতে দেখতে জেগে ওঠা এবং সম্পূর্ণরূপে সজাগ)। বাহ্যিক, অভ্যন্তরীণ অনুভূতি এবং স্মৃতি

VII. শক্তির উপস্থিতি – জাগ্রত অবস্থায় বোধশক্তির আরোহণ। শক্তি ও বল, যেটা সারা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

VIII. শক্তির নিয়ন্ত্রণ – জাগ্রত থাকার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী শক্তির গভীরতা এবং অবয়ব

IX. শক্তির বহিঃপ্রকাশ – শক্তির নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রণ হারানো

X. অনুভূতির প্রমাণ – অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য, এককতা এবং ধারাবাহিকতা

XI. আলোকিত কেন্দ্রবিন্দু – শক্তির রূপক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে মনের মাঝে অবস্থিত আলোকিত একটি কেন্দ্রবিন্দু। অনুভূতির সম্মেলনে আলোর দিকে আরোহণ করা যায় এবং মনের মাঝের টানাপড়েনে আলো থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া হয়।

XII. অনুভবের আবিষ্কার – শক্তির সঞ্চালন। আলোর রূপধারী এই শক্তির বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উদাহরণ

XIII. মূলনীতি – অভ্যন্তরীণ এককতার কিছু মূলনীতি

XIV. মনের অভ্যন্তরীণ পথ প্রদর্শন – আরোহণ করার বা অবনিত হবার দিকনির্দেশনার চিহ্নস্বরূপ কিছু রূপক

XV. শান্তির অভিজ্ঞতা এবং শক্তির অভিযাত্রা – প্রক্রিয়া

XVI. শক্তির অভিক্ষেপণ – অভিক্ষেপণের অর্থ

XVII. শক্তি হানি এবং শক্তির অবদমন – শক্তির নিঃসরণ। শক্তির কেন্দ্রীয় উৎস হিসেবে যৌনতা

XVIII. শক্তির ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া – আবেগ অনুভূতির নানান পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করানো। অনুভূতির ওপর নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট কোন চিত্র মাথায় নিয়ে আসা এবং পরে ঐ ছবির কথা ভেবে একই ধরণের অনুভূতি লাভ করা। দৈনন্দিন জীবনে প্রযোজ্য এমন একটি উপায় যেখানে মানসিক অবস্থার সাথে কোন ছবিকে সংযুক্ত করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

XIX. অন্তরের বিভিন্ন পর্যায় – অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আগ্রহী ব্যক্তি যেসকল মানসিক অবস্থার অনুভূতি লাভ করতে থাকে।

XX. অন্তরের বাস্তবতা – বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া যেটা বহির্জগতের নানান বিষয়বস্তুর রূপক হিসেবে দেখানো হয়।

বার্তা (El Mensaje)

সিলোর মন্তব্য

অধ্যয়ন এবং প্রতিফলন কর্মকেন্দ্র পার্ক,

পুন্তা দে বাকাস, এপ্রিল, ২০০৮

(তৃতীয় প্রচারঃ সিলো ডট নেট)

আজ আমরা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন পার্কে যেসকল বার্তাবাহক জড়ো হয়েছেন তাদের ব্যাপারে কথা বলছি। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেন আমাদের মন্তব্যের মূল বিষয়বস্তু যতটুকু সম্ভব সাধারণ এবং সার্বজনীন হয়।

বার্তার (El Mensaje) পূর্বকথা

শুরুতেই আমরা El Mensaje এর পূর্ববর্তী কিছু কথায় আলোকপাত করব যেটা ১৯৬৯ সালের দুটি লেখায় প্রকাশিত হয়েছিল। এর প্রথমটি হল একটি রচনা যেটা *La Mirada Interna* নামে পরিচিত এবং যেটা ১৯৬৯ সালে এখানে এই পুন্তা দে বাকাসেই লেখা শুরু হয়েছিল এবং ১৯৭২ সালে প্রথমবারের মত সেটার সম্পাদনা করা হয়। দ্বিতীয়টি হল একটি বিবৃতি, একটি ভাষণ, যেটা কিনা ১৯৬৯ সালের ৪ই মে এই একই স্থানে দেয়া হয়েছিল এবং যেটা *La Arenga de la Curación del Sufrimiento* নামে পরিচিত।

এই সংকলনগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রচারিত এবং প্রসারিত হতে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এসকল বই পুস্তিকা, রচনা, বিবৃতি, ভাষণ একত্রিত করে লেখকের অবদান এবং বক্তব্যকে এক জায়গায় করে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়া হয়েছে। এটা বলা বাঞ্ছনীয় যে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি প্রথম সেই দুটি লেখার কোন ধারাবাহিক বিবর্তনের ফল নয় এবং তা থেকে হুবহু সংগৃহীতও নয়। এটা বলে যেতে পারে যে এই বিবৃতির মূল বিষয়বস্তু অন্যান্য নানান বিষয়ের আলোকে দেখা যেতে পারে যেমন

সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান, সামাজিকতা ইত্যাদি। তাবৎ বিবৃতি আর ভাষণের মূল সারমর্ম সেই প্রথম দুটি লেখাতেই বিদ্যমান। সুতরাং বলা যায় যে পরবর্তীতে এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে যেসকল জনসভা আর কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করা হয়েছিল বা যে ধরণের চিন্তাভাবনার সম্প্রসারণ করা হয়েছিল তা ঐ দুটি লেখারই আরও বর্ধিত এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা মাত্র।

মাত্র কিছুদিন পূর্বে ২০০২ সালের জুলাই মাসে *El Mensaje de Silo* শিরোনামের অধীনে প্রথমবারের মত একটি সম্পূর্ণ ভলিউম হিসেবে el Mensaje প্রকাশিত হয়েছিল। এই লেখাগুলো তিন ভাগে বিভক্ত ছিলঃ, El Libro (বই), La Experiencia (অভিজ্ঞতা) এবং El Camino (পথ)।

"El Libro" আর *La Mirada Interna* একই। "La Experiencia" *El Mensaje* এর ব্যবহার্য ভাগ যেটা কিনা আবার ৮টি আচার অনুষ্ঠানে বিভক্ত। পরিশেষে, "El Camino" বিভিন্ন প্রতিফলন এবং উপদেশের একটি যৌথ সংকলন।

এখানেই আমরা el Mensaje এবং এর পূর্ববর্তী দুটি লেখার বিষয়ে আলোচনায় ইতি টানতে পারি। তথাপি আমি খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু জিনিসের কথা বলতে চাই যেটা *La Arenga de La Curación del Sufrimiento* বিবৃতি থেকে নেয়া এবং এগুলো পরবর্তীতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত এবং সামাজিক বিষয়কে ভিন্ন একটি দৃষ্টিভঙ্গি হতে দেখার সুবিধা প্রদান করেছে। উদাহরণস্বরূপ যেমন এটা উপলব্ধি করতে পারা যে ব্যথা এবং কষ্টের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।

La Curación del Sufrimiento
বিবৃতির পূর্বকথা

এই বিবৃতিতে জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে উপলব্ধির উল্লেখ করা হয়েছে সেটা হল কষ্ট এবং তা থেকে পরিত্রাণ। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল শারীরিক কষ্ট এবং মানসিক যাতনার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারা।

তিন ভাবে মানুষ যন্ত্রণাভোগ করেঃ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, স্মৃতির কারণে, কল্পনাশক্তির কারণে। যাতনাবোধ থেকে প্রতীয়মান হয় এক ধরণের সহিংসতা, যেটা কিনা ভয়ের সাথে সম্পর্কিত। যা আছে সেটা হারানোর ভয়, যা হারিয়ে গেছে সেটার ভয় বা যা অর্জন করতে চান সেটা না পাবার ভয়। যাতনাবোধ হয় কারণ হয়তবা ভয় আছে, বা সাধারণত ভয় নেই। রোগব্যাধির ভয়, দারিদ্র্যের ভয়, একাকীত্বের ভয় অথবা মৃত্যুভয়। সহিংসতার মূল কারণ হল অভিলাষ, ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা যেটা বিভিন্ন ধরণের এবং বিভিন্ন পর্যায়ের হতে পারে। কিছু আকাঙ্ক্ষা হতে পারে আকাশকুসুম কল্পনাসম আবার কিছু হতে পারে সহজ সরল এবং যথার্থ।

অন্তর নয়ন মেলে ধরবার জন্য এই ব্যাপারটা নিয়ে ব্যক্তি যদি গভীর ধ্যানে মগ্ন হয় তাহলে সে নিজ জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে সমর্থ হবে।

আশা প্রত্যাশা সহিংসতার উদ্রেক করে এবং সেটা ব্যক্তির মনের মাঝে চাপা থাকে না, বরং নানান সম্পর্কের ডালপালা বেয়ে সঞ্চালিত হতে থাকে।

এছাড়াও এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের সহিংসতা চোখে পড়বে এবং সব সহিংসতাই মূলত শারীরিক নয়। সহিংসতা হতে পারে অর্থনৈতিক, বর্ণবাদী, ধর্মীয়, যৌন, মানসিক, নৈতিক এবং অন্যান্য প্রকারের, কিছু কম কিছু বেশী এই যা।

[La Curación del Sufrimiento বিবৃতি থেকে উল্লেখিত অংশবিশেষঃ *মানুষের মাঝে সহিংসতা [...] পৃথিবীতে সহিংসতা থেকে পালিয়ে বাঁচার কোন মিথ্যে দুয়ার খোলা নেই।*]

এই বিবৃতিতে জীবনকে একটি নিতান্ত সহজ সরল পথে চালিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে বেদনাকে পরাজিত করার জন্য বিজ্ঞান এবং ন্যায়বিচারের দরকার আছে। তথাপি মানসিক যাতনা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মৌলিক প্রবৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করা অপরিহার্য।

এই বিবৃতির সারমর্ম এবং মূল বক্তব্য পরবর্তীতে বিবিধ বইপুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে যেমনঃ *Humanizar la Tierra*, *Cartas a mis amigos*, *Diccionario del Humanismo* এবং *Habla Silo*। এছাড়াও "La Acción Válida", "El sentido de la vida", "Humanismo y nuevo mundo", "La crisis de la civilización y el humanismo", "¿Qué entendemos hoy por humanismo universalista?"এর মত বিভিন্ন প্রদর্শনীতেও এর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

বইয়ের পূর্ব কথা La Mirada Interna

অন্য আরেকটি পূর্বকথা যেটার নাম *La Mirada Interna* জীবনের অর্থ কি সেটার ওপর আলোকপাত করেছে। এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল বৈপরীত্যে পীড়িত মানসিক অবস্থা। এই বিবৃতিতে যে বিষয়টির ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে সেটা হল এটা উপলব্ধি করা যে মনের মাঝে বৈপরীত্য সকল যন্ত্রণার মূল কারণ এবং এই মানসিক অশান্তি থেকে পরিত্রাণের জন্য জীবনকে এমন কর্মকাণ্ডে ভরিয়ে তুলতে হবে যেগুলো সাধারণত পারস্পরিকভাবে বিপরীতধর্মী নয় এবং বিশেষ করে অন্য মানুষের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রেও এহেন মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে হবে।

এই বইটিতে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক আধ্যাত্মিকতার একটি বীজ বপন করা হয়েছে এবং মনস্তত্ব ও নৃতত্ত্বের কিছু বিষয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে যেটার প্রভাব পরবর্তীতে *Psicología de la imagen* এবং *Apuntes de psicología* থেকে *Mitos raíces universales* পর্যন্ত বিভিন্ন বইয়ের ওপর পড়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জনসভাতেও এর অনুপ্রেরণা প্রতিফলিত হয়েছে যেমন "Acerca de lo humano", "La religiosidad en el mundo actual" এবং "El tema de Dios"। সেখানে *La Mirada Interna* কে আরও নতুন কিছু আঙ্গিকে দেখার সুযোগ হয়েছে এবং ধারণাগুলোর উচ্চতর বিশ্লেষণ দেখানো হয়েছে।

এটা পরিষ্কার যে *El Mensaje de Silo* এর পূর্ববর্তী যে দুটো কাজের ব্যাপারে আমরা কথা বলেছি সেগুলো একটা আরেকটার সাথে নীতিগতভাবে মিশ্রিত এবং পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত। বিশেষভাবে ২য় এবং ৩য় খণ্ড কারণ ১ম খণ্ড ছিল *La Mirada Interna* যেখানে তাঁর বক্তব্য সরাসরিভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

Las experiencias guiadas এর মত সাহিত্যকর্ম এবং অন্যান্য রচনায় এই অনুলিপি এবং অনুবাদগুলো উল্লেখিত হয়েছেঃ সেখানে গল্পও আছে কল্পনাও আছে। বিশেষ করে "El ensueño y la acción" অথবা "El Bosque de Bormazo"এ মনোবিজ্ঞানের আলোকে কিছু জোরালো যুক্তিতর্ক এবং ভাবনার খোরাক দেখা গিয়েছে এবং এই একই ধারণা যে পূর্ববর্তী বিবৃতিগুলোতেও উল্লেখিত হয়েছে সেটা আমরা শুরু থেকেই বলে এসেছি। এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের উপসংহার প্রাক্কালে আবারও উল্লেখ করতে চাই যে El Mensaje কেবল ব্যক্তিগত নয় বরং সামাজিক আধ্যাত্মিকতার বহিঃপ্রকাশও বটে। কালের বিবর্তনের সূত্র ধরে বিভিন্ন সংস্কৃতি, জাতীয়তা, সামাজিক এবং প্রাজন্মিক সকল স্তর জুড়েই এই অভিজ্ঞতার প্রমাণ চোখে পড়েছে। আরেকটা চির সত্য হল যে মনের মাঝে এই ধরণের উপলব্ধি পাবার জন্য, এর উন্নয়ন এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য কড়া অনুশাসন বা সুসংগঠিত কাঠামোর আসলে কোন প্রয়োজন নেই। একারণে যুগে যুগে

যেসকল নবী-রসুল, পয়গম্বর, দেবদূত, বার্তাবাহকের আবির্ভাব হয়েছে, অর্থাৎ যারা নিজেরা সেই বার্তা পেয়েছেন এবং অন্যদের কাছে তা পৌঁছে দেবার দায়িত্বে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তারা কিন্তু সবসময়ই মুক্তচিন্তা আর মুক্তবিশ্বাসের জয়গান গেয়েছেন এবং তারা বলেছেন নিজের সাথে যেমন ব্যবহার আশা করা হয় ঠিক তেমনটাই যেন অন্যদের সাথে করা হয়। ব্যক্তির একে অপরের সাথে এবং সামাজিক সকল সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই আত্মমর্যাদাকে উঁচু সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার কারণে এই বার্তাবাহকেরা সকল প্রকার বৈষম্য, অসাম্য আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ করে গেছেন।

সিলো

লেখকের প্রসঙ্গে

সিলো ছদ্মনামে পরিচিত মারিও লুইস রোদ্রিগেজ কোবোস ১৯৩৮ সালের ৬ই জানুয়ারি আর্জেন্টিনার মেন্দোজা শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

লেখক এবং চিন্তাবিদ, বহুবিধ গ্রন্থের রচয়িতা। El Humanismo Universalista বা Nuevo Humanismo এর মত চলমান চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠাতা। বিশ্বময় মানবজাতির সংকট থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হিসেবে অসহিংস পন্থার প্রবর্তক ও সমর্থক। এছাড়াও ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উন্নয়ন বিষয়েও তাঁর অবদান রয়েছে।

সিলো তাঁর মূল বার্তায় (el Mensaje) তাঁর প্রচারিত ধ্যানধারণার মুক্ত বিচার বিশ্লেষণ এবং আলোচনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

তাঁর মৌলিক প্রস্তাবনায় তিনি শারীরিক কষ্ট এবং মানসিক যাতনা থেকে পরিত্রাণের পথ দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

সিলো ২০১০ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বরে তাঁর জন্মস্থান মেন্দোজার চাক্রাস দে কোরিয়া গ্রামে নিজ বাসস্থানে মৃত্যুবরণ করেন।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ, লেখা ও বিবৃতি

www.silo.net

La Curación del Sufrimiento

En esta arenga se destaca la necesidad de contar con una conducta simple que oriente la vida; y también se dice que la ciencia y la justicia son necesarias para vencer el dolor, pero la superación de los deseos primitivos es necesaria para vencer el sufrimiento mental.

La Mirada Interna

Trata sobre el sentido de la vida. El tópico principal sobre el que discurre es el estado psicológico de contradicción. Allí se aclara que el registro que se tiene de la contradicción es el sufrimiento y que la superación del sufrimiento mental es posible en la medida en que se oriente la propia vida hacia acciones no contradictorias en general y, en particular, hacia acciones no contradictorias en relación con otras personas.

Silo

Otras obras del autor:

http://www.silo.net

EDiNexo